KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

| | |
|---|---|
| Record No. : KLMLGK 2007 | Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩ |
| Collection : KLMLGK | Publisher : মীর রহমান |
| Title চতুরঙ্গ | Size 7'x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m. |
| Vol. & Number : ৫৪/১<br>৫৪/২<br>৫৪/৩<br>৫৪/৪ | Year of Publication : বৈশাখ ১৪০০<br>শ্রাবণ ১৪০০<br>অগ্রহায়ণ ১৪০০<br>চৈত্র ১৪০০ |
| | Condition : Brittle Good ✓ |
| Editor : আবদুর রউফ | Remarks : |

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

# চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৩ ফাল্গুন ১৪০০

মাওয়ের জন্মশতবর্ষে তাঁর অবদানের মৌলিকত্বের দিকগুলি চিহ্নিত করেছেন অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য। এই সঙ্গে থাকছে মাওজীবনের ঘটনাপঞ্জী এবং বিজ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচনের ফলে দান্দ্বিক বস্তুবাদের পুরাতন ব্যাখ্যা সম্পর্কে সংশয়ান্বিত চিত্তের মৌলিক প্রশ্ন।

স্মৃতিচারণের মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে সম্প্রতি প্রয়াত মনীষী গোপাল হালদারের স্মৃতি পর্যালোচনা করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লোকসাহিত্যের গবেষক অধ্যাপক বেণু দত্তরায় লিখেছেন তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ ''সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন বাংলার লোকসাহিত্য''।

আধুনিক বাংলা গানের ক্রমবিবর্তিত সংকটের স্বরূপ এবং উত্তরণের দিকনির্দেশ নিয়ে গভীর বিশ্লেষণধর্মী দীর্ঘ তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা।

সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, শিক্ষাসমস্যা, লৌকিক গান, অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞগণকৃত একগুচ্ছ গ্রন্থসমালোচনা।

''একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা''-এর শেষাংশ।

গঙ্গার জলবন্টন সমস্যা নিয়ে ফ্রন্টিয়ার সম্পাদক তিমির বসু লিখেছেন, ''গঙ্গা এখন ভাগের 'মা' ''।

সদ্যপ্রয়াত শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় স্মরণে একটি আলোচনা এবং তাঁর অন্তিম সময়ের কবিতা ''একটি আত্মজৈবনিক প্রশ্ন''।

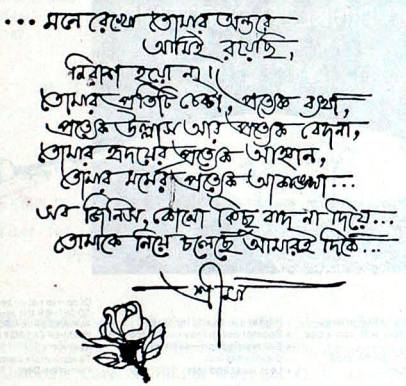


বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৩
ফাল্গুন ১৪০০

মার্কসবাদ ও মাও সে তুঙ ▢ জ্যোতি ভট্টাচার্য ১৮৯
মাওজীবনের ঘটনাপঞ্জী ▢ সুজিৎ ঘোষ ১৯২
মাও সে তুঙ : শতবর্ষে ফিরে দেখা ▢ প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৭
'জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়' : গোপাল হালদার ▢ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৮
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন বাংলার লোকসাহিত্য ▢ বেণু দত্তরায় ২২১
আধুনিক বাংলা গান — একটি পর্যালোচনা ▢ সুভাষ বাগচী ২২৯

**কবিতা**

অন্যায় বৃষ্টি ▢ আল মাহমুদ ২০০
একটি আত্মজৈবনিক প্রশ্ন ▢ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ২০২
কুহক ▢ মধুষ দাশগুপ্ত ২০৪
প্রবাসে তোমার ঠিকানা ▢ অসীম রেজ ২০৫
আলোকিত তিনটি পলক ▢ সুমন গুণ ২০৬
মণিমালা বলছি ▢ ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৭

**গল্প**

হস্তান্তর ▢ গুণময় মান্না ২১৩

**গ্রন্থ সমালোচনা**

শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৮ ▢ সনাতন মিত্র ২৪০ ▢ পুলকনারায়ণ ধর ২৪২ ▢ সুধীর চক্রবর্তী ২৪৬ ▢ অধীর ঘটক ২৪৮ ▢ সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৯ ▢ গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫০ ▢ সুরজিৎ দাশগুপ্ত ২৫১

**সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি**

একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা ▢ কাজী সুফিউর রহমান ২৫৫
গঙ্গা এখন ভাগের 'মা' ▢ তিমির বসু ২৬১

**স্মরণে**

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ▢ অনির্বাণ রায় ২৬৩

**মতামত**

'শেখ আব্দু'-র তৃতীয় সংস্করণ ▢ শৈলবালা ঘোষজায়া প্রসঙ্গ ২৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক গুপ্ত প্রেস, কলি-৯ থেকে মুদ্রিত
এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত
অফিস ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা - ১৩ দূরভাষ ২৭ ৬৩২৭
শিল্প পরিকল্পনা রণেনআয়ন দত্ত নির্বাহী সম্পাদক আবদুর রউফ

# সংগ্রহে রাখার জন্য সেরা বই বেছে নিন

**বাংলা বই**

| | |
|---|---|
| আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন | ৩৪.০০ |
| বঙ্কিমচন্দ্রের নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ —অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত | ৩২.০০ |
| মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন | ২৭.০০ |
| একুশটি বাংলা ছোট গল্প —অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত | ১৪.০০ |
| হেনরি ডিরোজিও — সুবীর রায়চৌধুরী | ৩০.০০ |
| হরিনাথ দে — সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭.৫০ |
| ক্ষিতিমোহন সেন — ভবতোষ দত্ত | ৮.২৫ |
| পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি — আশুতোষ ভট্টাচার্য | ২৪.০০ |
| সিকিম — ডঃ অপর্ণা ভট্টাচার্য | ২৪.০০ |

**প্রতিবেশী সাহিত্য**

| | | |
|---|---|---|
| কন্নড় : | অনাদি অনন্ত — শ্রীরঙ্গ | ১৪.০০ |
| | চিক্কবীর রাজেন্দ্র — মাস্তি বেঙ্কটেশ আয়েঙ্গার | ৩২.০০ |
| | গৃহভঙ্গ — এস. এল. ভৈরাপ্পা | ৩০.০০ |
| | মুক্তি — শান্তিনাথ দেশাই | ৩২.০০ |
| | মৃত্যুর পরে — শিবরাম কারন্ত | ১৮.০০ |
| মলয়ালম : | নালুকেট্টু — এম. টি. বাসুদেবন নায়ার | ১৬.০০ |
| | পুতম্মার ছাগল ও বাল্যসখী — ভৈকম মু. বশীর | ১০.০০ |
| | ফেলে আসা দিনগুলি — কে. পি. কেশব মেনন | ২৮.০০ |
| | মলয়ালম একাঙ্কগুচ্ছ | ২০.০০ |
| | সমকালীন মলয়ালম ছোটগল্প সঙ্কলন | ২৫.০০ |
| হিন্দী : | প্রেমচন্দের গল্পগুচ্ছ | ৩৮.০০ |
| | বিন্দু ও সিন্ধু — অমৃতলাল নাগর | ৩৭.০০ |
| | মানুষের রূপ — যশপাল | ২০.৭৫ |
| | ময়লা আঁচল — ফণীশ্বর নাথ 'রেণু' | ১৮.৭৫ |
| ওড়িয়া : | ওড়িয়া ছোট গল্প সঙ্কলন | ১০.০০ |
| | দানাপানি — গোপীনাথ মহান্তি | ২২.০০ |
| | বিষণ্ণ চন্দ্রমা — উপেন্দ্রকিশোর দাশ | ৯.৫০ |
| | শাস্তি — কানুচরণ মহান্তি | ২৪.০০ |
| উর্দু : | অশ্রুসজল লালকেল্লা — খাজা আহমদ ফারুকী | ৬.২৫ |
| | উর্দু গল্প সঙ্কলন | ২৪.০০ |
| | পুরানো লখনউ — আব্দুল হলীম 'শরর' | ২১.২৫ |
| | বহ্নি সাগর — কুরতুলয়েন হায়দার | ২৯.০০ |

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি 110016

পূর্বাঞ্চল শাখা কার্যালয়, 5A, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা 700073


# মার্কসবাদ ও মাও সে তুঙ

জ্যোতি ভট্টাচার্য

## এক ☐ মাও সে তুঙ-এর অবদান

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন তাঁদের পার্টি-সংবিধানে ঘোষণা করলেন যে চিন্তাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রেরণা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং ''মাও সে তুঙ চিন্তাধারা'' তখন এদেশে আমরা কেউ কেউ ভ্রূ কুঁচকেছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই তো যথেষ্ট, আবার 'মাও সে তুঙ চিন্তাধারা' যোগ করার প্রয়োজন কী ? 'মাও সে তুঙ চিন্তাধারা' কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বাইরে একটা পৃথক কিছু ? চীনা জাতীয়তাবোধকে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে শান্ত রাখার জন্যই কি 'মাও সে তুঙ চিন্তাধারা' যোগ করা হচ্ছে ? আমাদের ভ্রূকুঞ্চন মিলিয়ে যেতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে। এক হিসাবে লেনিনবাদও তো মার্কসবাদ থেকে পৃথক কিছু নয়। তথাপি, সাম্রাজ্যবাদের যুগে লেনিনের চিন্তা ও কর্মকাণ্ড মার্কসবাদকে জীবন্ত রেখেছিল বিশেষ কয়েকটি প্রাণবান প্রত্যয় সংযোজন করে। লেনিনের সময়ে বেশ কিছু দল ও মানুষ নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিলেও লেনিনের বিরোধিতাই করতেন। এঁদের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করার জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শব্দটি অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। মাও সে তুঙের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ড এমনিভাবেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে কয়েকটি প্রাণবান নবীন প্রত্যয় সংযোজন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মাও সে তুঙ চিন্তাধারাকে অবহেলা করে বা তার বিরোধিতা করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবন্ত রাখা আর সম্ভব ছিল না। চীনের বাস্তব ইতিহাসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে মাও সে তুঙ চিন্তাধারার সংযোগ যুগান্তকারী ঘটনা। এই ঘটনার তরঙ্গ শুধু চীনের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সারা বিশ্বে মার্কসবাদী চর্যায়, বিচার-বিবেচনা ও কর্মকাণ্ডের ভাষায় বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। মাওয়ের বিশাল কর্মকাণ্ড ও সমৃদ্ধ চিন্তার বিশদ আলোচনা অনেকখানি পরিসর দাবী করে। এই প্রবন্ধে আমরা সে চেষ্টা করব না। যেসব কথা অন্য অনেকে বলছেন বা বলতে পারবেন, সেসব কথা এখানে উল্লেখ না করে আমরা এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি বিশেষ কথা নিবেদন করব। কথা কয়টি এভাবে বলা চলে : —

(ক) মাও সে তুঙ এর পূর্বপর্যন্ত ইয়োরোপীয় অভিজ্ঞতাই মার্কসবাদী চর্যার ভিত্তি ছিল। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব মার্কসবাদী চর্যার পশ্চিম-ইয়োরোপের ভিত্তির ওপরে রাশিয়ার অভিজ্ঞতার নতুন ভিত্তি যোজনা করেছিল। এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মার্কসবাদে জীবন্ত সংযোগ হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে লেনিন ও অন্য নেতারা সচেতন থাকলেও বাস্তবে সে সংযোগ ঘটেনি। মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের বৈপ্লবিক মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। একটু বেশি ঝোঁক দিয়ে কথাটা বললে বলা চলে, মাও মার্কসবাদকে চীনা ভাষা শিখিয়েছিলেন। নতুন অভিজ্ঞতা, ভিন্ন অভিজ্ঞতা ভাষায় নতুন উপাদান দাবী করে। সে দাবী পূরণ না হলে, অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় না, অভিজ্ঞতাই হয় না।

(খ) এই কথাটারই আরেক দিক হল, মাও মার্কসবাদের চীনা ভাষা নির্মাণ করেছিলেন। মাও রচনাবলীর ইংরেজি অনুবাদ পড়েই দেখা যায় মাও-এর শব্দচয়ন বাক্যগঠন ও বাচনভঙ্গী যথার্থ সৃষ্টি, তা অনুবাদ-প্রসূত নয়। এ কথাটা আমাদের পক্ষে বিশেষ করে বলা এবং ভাবা দরকার, কারণ, আজও আমাদের দেশে মার্কসবাদী চর্যা অনুবাদ-আশ্রয়ী, আমরা এ যাবৎ মার্কসবাদের কোনও ভারতীয় ভাষা নির্মাণ করে উঠতে পারিনি। সন্দেহ নেই, বহু সমৃদ্ধ ভাষার দেশ ভারতবর্ষে কাজটা খুবই কঠিন এবং জটিল। তথাপি, মার্কসবাদ যতদিন ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে না পারবে ততদিন তার প্রয়োগ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

(গ) ওপরের দুটো কথার সঙ্গে জড়িত একটি মূল কথা। জ্ঞানের উৎস বাস্তব সত্য, যে কোনো তত্ত্বের পরীক্ষা বাস্তব প্রয়োগে — মার্কসবাদী দর্শনের এই প্রাথমিক প্রত্যয়কে মাও পুনরায় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মার্কসবাদী পার্টির তত্ত্ব, নীতি, কর্মসূচি, সংগ্রামের দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি কৌশল সবই চীনের জনজীবনের বাস্তবতার মধ্যে বারম্বার পরখ করে নিতে হবে। ভুলভ্রান্তি শুধ্রে নিতে হবে, তোতাপাখির বুলি আঁকড়ে চলা যাবে না, চীনের বিপ্লবকে নিজের পথ নির্মাণ করে

নিতে হবে— এ কথাগুলো বলা সহজ ছিল। কিন্তু কাজে করা সহজ ছিল না। মাও তাঁর জীবনের শেষ ভাগে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম পর্বে সহযোগীদের আহ্বান করেছিলেন, "নিজে চিন্তা করার সাহস রাখ, নিজের মত স্পষ্ট করে বলার সাহস রাখ" ['Dare to think, dare to speak']। ওই আহ্বান চলমান জীবনের সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার আহ্বান।

### দুই ☐ কমিনটার্ন-এর ব্যর্থতা

ঘটনাচক্রে মাও সে তুঙ এবং চীনের বিপ্লবী সংগ্রামীরা সত্যনিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তা ও তদনুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনার একটা বড় সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন — কমিনটার্ন নেতৃত্ব তাঁদের রেহাই দিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৬ সালের দারুণ পরাজয়ের পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর কমিনটার্ন-এর খবরদারি ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৫-এর যুক্তফ্রন্ট নীতির পর এই খবরদারি একেবারেই উবে গিয়েছিল বললে বেশি বলা হবে না। ফলত, চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে কয়েকবার ভেঙে গড়া হয়েছিল এবং জনজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল, সংক্ষেপে 'কমিনটার্ন' অনেক ভাল কাজ করেছিলেন, বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীদের কিছু অনুপ্রেরণা ও রসদ জুগিয়েছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কমিনটার্নের নেতৃত্বে বিশ্বের কোথাও বিপ্লবী সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করেনি। চীনের বিপ্লবের সাফল্যে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। কিউবার বিপ্লব তো কমিউনিস্ট পার্টির আওতার বাইরেই ঘটেছিল, কিউবার তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টি তার বিরোধিতাই করেছিলেন। ইন্দোচীনে, ভিয়েতনামে হো চি মিন কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টি নাম দিয়ে নতুন পার্টি নির্মাণ করেছিলেন। এরকম দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি দেওয়া যায়। কমিনটার্ন-এর ব্যর্থতার কারণ একাধিক। তার কয়েকটি আবার ইতিহাস-নির্দিষ্ট অনিবার্য ব্যাপার। কিন্তু একটি গুরুতর কারণ কমিনটার্ন এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সাংগঠনিক নীতি ও বন্দোবস্ত। এই বিষয়ে কিছু কিছু ঘোলাটে বিতর্ক মাঝে মাঝে শোনা যায় 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা' ডেমোক্র্যাটিক সেনট্রালিজমা নিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটা আনুপূর্বিক প্রণিধানের প্রচেষ্টা এযাবৎ দেখা যায়নি।

এই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাণ্ডের কথা আমি ইতিপূর্বে অন্য একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলাম ১৯৭৩ সালে সেসময়কার একটি মাসিক পত্রিকায়; পরে ১৯৭৪ সালে 'পরিপ্রশ্ন' নামক গ্রন্থে এ প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু, কাণ্ডটা বিশেষ কারুর নজরে পড়েছে মনে হয় না বলে এখানে আবার উল্লেখ করছি।

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ বিশ্বসম্মেলনে লেনিন একটি বক্তৃতায় বলেন — "১৯২১ সালে তৃতীয় বিশ্বসম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাংগঠনিক কাঠামো এবং কাজকর্মের পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে সেই প্রস্তাবটা নিয়ে আমরা এক প্রকাণ্ড ভুল করেছি, নিজেদের অগ্রগতির রাস্তা বন্ধ করেছি"। ['I have the impression, that we made a big mistake with this resolution, that we blocked our road to further success.' — Lenin, Selected Works, Moscow, 1971, Vol. III, pp. 727-728. Collected Works, Moscow, 1966, vol 33, pp. 430-1]

সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতি সম্পর্কে এই প্রস্তাবে লেনিন যে দোষটা দেখেছিলেন তা হল 'এটা প্রায় আগাগোড়াই রাশিয়ান।' খুব ভাল অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটা রাশিয়ান অভিজ্ঞতা দ্বারাই পরিচালিত। "বিদেশিরা এটা পড়লেও বুঝবে না; আর, বুঝতে পারলেও কাজে লাগাতে পারবে না; কারণ, এটা পুরোপুরি রুশ মনোভাবে আচ্ছন্ন" ['thoroughly permeated with the Russian spirit'g]।

লেনিন এই প্রস্তাবটা সম্বন্ধে এইরকম তীক্ষ্ণ সমালোচনা করার পরেও পরবর্তী কোনও কমিউনিস্ট পার্টির কোনও সম্মেলনে এ প্রস্তাব বর্জন করে অন্য নতুন প্রস্তাব ওঠেনি। ১৯২৩ সালে লেনিনের মৃত্যুর পরে এ ব্যাপারে আর কেউ নজর দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

শুধু রাশিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতির নিয়মাবলী প্রণয়ন করা চলে না, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহার ও তার নির্যাস নিষ্কাশন প্রয়োজন, এটা তো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী মার্কসবাদের প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যেই পড়ে। তথাপি, লেনিনের নির্দেশ সত্ত্বেও কমিনটার্ন ও সবকয়টি কমিউনিস্ট পার্টি এ ব্যাপারটাকে অবহেলা করলেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিজ নিজ দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করার নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অপসৃত করে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির অক্ষম প্রতিধ্বনি-যন্ত্রে পরিণত করল। এই ব্যর্থতার দায়িত্ব কমিনটার্ন নেতৃত্বের ওপর যতটা বর্তায়, বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির আপন আপন নেতৃত্বের ওপরেও ততটাই বর্তায়। মাও সে তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যর্থতার গ্লানি কাটিয়ে উঠে বিপুল বিজয়ের গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে কয়েকবার ভেঙে গড়েও মাও সে তুঙ পার্টি-সংগঠনের সমস্যার কোনও চিরকালীন সমাধান খুঁজে পাননি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্যতম রণধ্বনি 'সদর দফতরে কামান দাগো' তো এক অর্থে পার্টির সাংগঠনিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বনি, পার্টি সংগঠনের শৃঙ্খলায়



আবদ্ধ কর্মধারায় চলমান জীবনের নতুন জোয়ারের ধাক্কা লাগানোর প্রয়াস। এ প্রয়াস এখন সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছে।

সম্ভবত এ সমস্যার কোনও চিরকালীন সমাধান হয় না। সম্ভবত বারবার জোয়ার-ভাটার মধ্য দিয়ে, উত্থান-পতনের টানাপোড়েনে এ সমস্যার রূপ পরিবর্তিত। ইতিহাস সরলরেখা ধরে চলে না।

### তিন ☐ সমাজতান্ত্রিক প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রয়োজন

মাও-এর জীবনের শেষভাগে একটি বিশাল প্রশ্ন তাঁর মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছিল। তখন রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্ক প্রায় শত্রুতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চীন-রুশ যুদ্ধ যে কোনওদিন শুরু হতে পারত। চীনের সামরিক আত্মরক্ষার তাগিদ খুব জরুরি হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে বহুদিনের চেনা পুরনো দুশমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুশমনি একটুও না কমিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চীনকে লড়িয়ে দেওয়ার খেলা খেলছিল। চীনকে কিছু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োগকৌশল বিক্রি ক'রে মোটা মুনাফা লোটার তালেও মার্কিনি ঘোরাফেরা চলছিল।

এই পরিস্থিতিতে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যে কোনও লোক বলবে, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অগ্রসর দেশ থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রয়োগকৌশল আমদানি কর, চীনের গণযুদ্ধ ফৌজকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে ও যুদ্ধকৌশলে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত করে একটি পুরোদস্তুর আধুনিক সামরিক বাহিনীতে পরিণত কর।' অনেকেই জানেন যে বর্তমানে চীনের কর্ণধার তেঙ্ সিয়াও পিঙ্ এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন, কিন্তু মাও-এর কাণ্ডজ্ঞান ও দূরদৃষ্টি অ-সাধারণ ছিল। মাও এই আধুনিকীকরণ-এর বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ এটা ছিল ধনতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ।

এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটা এসে যায় তা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা কি সামাজিক সম্পর্কের জালের বাইরে, সমাজ-সংগঠন-নিরপেক্ষ কোনও বিদ্যা? আরো তীক্ষ্ণভাবে বলা উচিত, ধনতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কি কোনও চরিত্রগত পার্থক্য থাকবে না? সমাজতন্ত্র কি ধনতন্ত্রের আওতায় সৃষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর নির্ভর করেই চিরকাল চলবে?

মার্কস এঙ্গেলস লেনিন স্তালিনের সামনে এ প্রশ্ন আসেনি। আমাদের এই কালে এ প্রশ্ন এসেছে। মাও এ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন, চীনের জীবনে তিনি ধনতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ বর্জন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ প্রশ্নের বিশদ বিচার করে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা পথনির্দেশ করে যাওয়ার মতো সময় তিনি আর পাননি। পৃথিবী জুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংসের যে অভিযান সম্বন্ধে আমরা আজ অল্পস্বল্প সচেতন হচ্ছি তার মূখে দাঁড়িয়ে আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে অনেকখানি গভীরে গিয়ে পুনর্বিবেচনা করা অবশ্যকর্তব্য বলে বিবেচনা করি। নিতান্ত সাধারণ মানুষের ঘরের দাওয়ায় বা উঠানে যে প্রযুক্তি কাজে লাগতে পারে, যে প্রযুক্তি মানুষকে অমানুষ করে না, যে প্রযুক্তি প্রাকৃতিক সম্পদ বিনাশ করে না, সেই বিকল্প প্রযুক্তি অনুসন্ধান সমাজতন্ত্র এ যাবৎ করেনি। আজকের বিশ্বসংকটে এই অনুসন্ধান মার্কসবাদের পক্ষে নতুন জীবনের সন্ধান।

# মাওজীবনের ঘটনাপঞ্জী

**সংকলক — সুজিৎ ঘোষ**

চীনের ইতিহাসের আধুনিক যুগের প্রধান পর্বটির সঙ্গে মাও-এর নাম জড়িত। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৬ থেকে ১৯৭৬ এই দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দির চীনা ইতিহাসে তাঁর নাম উচ্চারিত হবেই। ইতিহাসে ব্যক্তির মূল্যায়ন চলতেই থাকে, রাজনীতিতে প্রতিটি সময়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কতখানি সফল বা বিফল — আজ সে সম্পর্কে বিতর্ক চলছে। সে-বিতর্কের এখনও শেষ হয়নি। আজকের সিদ্ধান্তও যে ভবিষ্যতকাল মেনে নেবে, — ইতিহাসে এমনটিও প্রত্যাশা করা চলে না। কিন্তু বিশ শতকের চীন — খণ্ড-বিখণ্ড, নানা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও যুদ্ধবাজদের লীলাভূমি, দরিদ্রতম, ক্রমিক দুর্ভিক্ষ, জাতীয় অবমাননা, অশিক্ষা থেকে বিশ্বের অনতম সুশৃঙ্খল, সভ্য, আত্মনির্ভর এবং আত্মশক্তিতে বলীয়ান জাতি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে মাও-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৫৮-র 'মহান উল্লম্ফন' বা ১৯৬৭-এ 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর ফল নিয়ে বিতর্ক চলেছে। তাতে মাও-এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করা যাবে না। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধ করতে করতেই যুদ্ধ শিখেছেন এবং সেই শিক্ষাই তাঁর সামরিক রচনাগুলিতে লিখে গেছেন। স্তালিনের মৃত্যুর পর যে বিশ্বরাজনীতি, তার ভরকেন্দ্রে মাও পরিচালিত চীন, মাও-এর মৃত্যুকাল পর্যন্ত। সোভিয়েত ও মার্কিন এই দুই বৃহৎ শক্তিকে তাদের ভূমিকা স্থির করতে হয়েছে চীনের কথা ভেবে, চীনকে হিসাবে ধরে।

মাও-এর দেশপ্রেমের এক চিত্রময় বর্ণনা পাওয়া যাবে চার্লি চ্যাপলিনের 'আত্মকথায়' এবং মাও সে তুঙের কবিতা সংগ্রহে। কবি বলেই শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, ইয়েনানের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা, অন্য যে কোনও রাজনীতিবিদদের সাহিত্য বিষয়ে বক্তব্য থেকে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। জীবনের উপান্তে এডগার স্নোকে বলেছিলেন যে তিনি এক নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, যিনি ফুটো ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটছেন। চৌ এন লাই এর উদ্দেশে তাঁর শেষতম কবিতাটিতে তাঁর হতাশা না গভীর দেশানুরাগ, না কি উভয়ই ?

"কত না একনিষ্ঠ জনক জননী
দেশের জন্যে দিয়েছে অসীম আত্মাহুতি
কখনও তারা ডরায় নি ভেবে অন্তিম পরিণাম।
আজকে যখন এদেশ হয়েছে
লাল, এখন কে নেবে শুভ অশুভের দায় ?
আমাদের যত অপূর্ণব্রত হয়তো বা পাবে হাজার বছরে পূর্ণতা
ক্লান্ত করছে সংগ্রাম আর আজ আমাদের শুভ্রকেশ,
আমাদের সব প্রয়াস গ্রাবনে যদিই বা যায় ধুয়ে মুছে
তুমি আর আমি, পুরাতন সখা, আমরা কি পারি
শুধু নিঃসাড়ে দেখে যেতে ?"

মাও-এর জীবন ও চীনের সময়কালের ইতিহাস একই রেখায় প্রবাহিত। তাই মাও-জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জী এবং সমপর্বের চীনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণগুলিকে এখানে সংকলিত করে দেওয়া হল।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেনের জন্ম। তিনিই দেশকে বিদেশি শাসনমুক্ত করার জন্যে ১৯১২ সালে কুও মিনতাং (বা Nationalist Party) গঠন করেন।

১৮৯৩ (২৬ ডিসেম্বর) সান ইয়াৎ সেনের জন্মের সাতাশ বছর পরে চীনের হুনান প্রদেশে মাও সে তুঙের জন্ম।

১৯০০ মাও-এর জন্মের বছরটি থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও চীনে ঘটে গেছে ইতিহাসের অনেক ঘটনা। ফরাসিরা লাওস কাম্পুচিয়াসহ ইন্দোচীন দখল করেছে ('৯৩), জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত চীন ফরমোজা দ্বীপের দখল জাপানকে দিতে এবং কোরিয়ার ওপর আধিপত্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয় (১৮৯৪-০৫)। ১৯০০ সালে বিদেশি বিরোধী বকসার বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের পরাজয়ের ফলে জার-রাশিয়াও চীনের কাছ থেকে নানা সুযোগ আদায় করে নেয়। ১৯০৫-এ প্রথম রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়। মাও তখন তাঁর বাবার খামারে কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

১৯১১ গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা প্রথম বিপ্লব। সান ইয়াৎ সেন অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি ঘোষিত হন। মাও



বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং বিপ্লব সফল হয়েছে এই ধারণায় ছ'মাস পরে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন।

১৯১২-১৪ যুদ্ধবাজ ইউয়ান সিহ্ কা'ই চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয় — সান রাষ্ট্রপতি পদ ত্যাগ করেন। জাপান আবার একুশটি দাবি পেশ করে, যা ইউয়ান মেনে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। জাপান চীনের কিছু অংশ দখল করে। মাও প্রথম পশ্চিমি পণ্ডিতদের গ্রন্থাদির পাঠ শুরু করেন।

১৯১৫ চেন তু শিউ নিউ ইউথ পত্রিকা প্রকাশ করেন; এই পত্রিকা বিপ্লবী যুব আন্দোলন এবং সহজ ভাষায় বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। এই পত্রিকায় মাও ছদ্মনামে নিবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন।

১৯১৭ রুশ বিপ্লব। চীনে পিকিং-এর যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সান ইয়াৎ সেন ক্যান্টন থেকে যুদ্ধ শুরু করেন। হুনানে মাও নিউ পিপলস্ স্টাডি সোসাইটি নামে বিপ্লবী যুব গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

১৯১৮ হুনান ফার্স্ট নর্মাল স্কুল থেকে পঁচিশ বছর বয়সে স্নাতক হন এবং পিকিঙে গিয়ে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক লি তা-চাও-এর সহকারী হিসেবে যোগ দেন। লি তা-চাও ও চেন তু শিউ স্থাপিত মার্কসিস্ট স্টাডি সোসাইটিতে যোগ দেন। এই তিনজনই পরবর্তীকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

১৯১৮-১৯ মিত্র শক্তিকে সাহায্য করার জন্য এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চীনা শ্রমিককে বিদেশে পাঠানো হয়, এদের দোভাষী হিসেবে ৪০০ ছাত্রকেও বিদেশে পাঠানো হয়, যাঁদের মধ্যে একজন চৌ এন লাই। মাও ছাত্রদের সঙ্গে সাংহাই পর্যন্ত যান। মাও হুনানে ফিরে আসেন এবং সাম্রাজবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী, রুশ বিপ্লবের সমর্থক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ বছরেই সারা দেশব্যাপী ভার্সাই চুক্তির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন — মে ফোর্থ মুভমেন্ট শুরু হয়।

১৯২০ হুনানে মাও সমাজতন্ত্রী যুবদলের শাখা সংগঠিত করেন, লিউ শাওচি এই সংগঠনে একজন সভ্য হিসাবে যোগ দেন। নর্মাল স্কুলে মাও-এর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ইয়াং চ্যাঙ-চি, এই বছরেই মাও অধ্যাপক ইয়াঙের কন্যা ইয়াং কাই-হুইকে বিবাহ করেন। কালচারাল বুক স্টাডি সোসাইটি নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে মাও সাহায্য করেন।

১৯২১ এই বছর সাংহাইতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন (congress) হয়, মাও এই সম্মেলনে যোগ দেন। মাও হুনানের পার্টি সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২২-২৩ সান ইয়াৎসেন লেনিনের প্রতিনিধির সোভিয়েত সহায়তার প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। অতঃপর কমিউনিস্টরা কুও মিনতাং-এর সভ্যপদ নিতে পারত। কুও মিনতাং-কমিউনিস্ট পার্টি (চীনা) এবং সোভিয়েত জোট চলতে থাকে। ক্যান্টনে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় সম্মলনে (১৯২৩) মাও কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য এবং সাংগঠনিক ব্যুরোর প্রধান নির্বাচিত হন।

১৯২৪ কুও মিনতাং-এর প্রথম সম্মেলনে কমিউনিস্টদের অন্তর্ভুক্তি সম্মতি লাভ করে এবং কুও মিনতাং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বিকল্প (alternate) সদস্য হিসেবে মাও নির্বাচিত হন। লেনিনের মৃত্যু এই বছরেই।

১৯২৫ মাও হুনানে ফিরে আসেন, জাতীয় মুক্তির সহায়ক শক্তি হিসেবে কৃষকদের সমর্থন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রথম চিরায়ত রচনা 'চীনা সমাজে শ্রেণীসমূহের বিশ্লেষণ' লিখিত হয়। সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যু ঘটে। রুশ পরামর্শদাতা চিয়াং কাই শেককে কুও মিনতাং-এর প্রধান সেনাপতি হিসেবে বেছে নেন।

১৯২৬ ক্যান্টন থেকে জাতীয় বিপ্লবী অভিযান শুরু হয়, চিয়াং সর্বোচ্চ সামরিক কর্তা। মাও ক্যান্টনে কুও মিনতাং কৃষক ব্যুরোর ও কৃষক আন্দোলন শিক্ষা ইনস্টিটিউটের সহ-অধিকর্তা হিসেবে থেকে যান। বিপ্লবী প্রচার ও বিক্ষোভ (agit-prop) দপ্তরের প্রধান ছিলেন মাও। কুও মিনতাং-কমিউনিস্ট বাহিনী দক্ষিণ চীনের বেশির ভাগ জয় করে।

১৯২৭ মাও-এর দ্বিতীয় বিখ্যাত রচনা 'হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট, প্রকাশিত হয় — যেখানে 'গরিব কৃষক'কে বিপ্লবের মূলশক্তি এবং জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার দাবি করা হল। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই তত্ত্বকে নাকচ করে দেয়। এপ্রিলে চিয়াং কাই শেকের কমিউনিস্ট বিরোধী কুাতে পার্টির সভ্যসংখ্যা ১০,০০০ এর মতো হ্রাস পায় — পার্টি সম্পাদক হিসাবে চেন তু শিউকে সরে যেতে হয়। মাও

হুনানে কৃষক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন (অগাস্ট মাসে), কিন্তু পরাজিত হয়ে চিঙকাঙের দুর্গম পাহাড়ে ঘাঁটি গড়েন। নানচাং অভ্যুত্থানও ব্যর্থ হয়, কান্টন অভ্যুত্থানও ব্যর্থ হয়।

১৯২৮ চিয়াং-এর একনায়ককে নামেমাত্র কেন্দ্রীয় অধিপত্যে 'জাতীয় সরকার' স্থাপিত হয়। চিঙকাঙ পাহাড়ে চু তে ও মাও সে তুঙের বাহিনী মিলিত হয়ে 'চীনা লাল ফৌজ' সৃষ্টি হল এবং আঞ্চলিক সোভিয়েত গঠিত হল। মাও লিখলেন "লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার এলাকা চীনে কেন টিকে থাকতে পারে"।

১৯২৯ কিয়াংসি প্রদেশের জুইচিনে গ্রামাঞ্চল জয় — মাও-চু তে আঞ্চলিক সোভিয়েত সরকার স্থাপনের কথা ঘোষণা করলেন। পার্টির পলিটব্যুরো বিদেশি নিয়ন্ত্রণাধীন সাংহাই-এ আত্মগোপন করে থাকল, লি লি-সান তখন পার্টি নেতৃত্বে।

১৯৩০ মাও-এর 'গ্রামাঞ্চলের সোভিয়েত আন্দোলনের' পথার সঙ্গে লি লি-সান-এর বিরোধ। লি লি-সান শহরে অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী। মাও এবং পেং তে-হুইএর নেতৃত্বে লাল ফৌজ হুনানের রাজধানী চাংশা দখল করেও পিছু হটে আসে। দ্বিতীয়বার চাংশা দখলের চেষ্টা বহু ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে ব্যর্থ হয়। চিয়াং লাল ফৌজের ওপর প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ করে। "একটি স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে"। লেখায় মাও 'ঘাঁটি এলাকা' স্থাপনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

১৯৩১ ওয়াং মিঙ চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। জুইচিনের প্রত্যন্ত অভ্যন্তরে সমগ্র চীন চীনা সোভিয়েত (All China Chinese Soviet) সম্মেলনে নিখিল চীন সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, — মাও সভাপতি এবং চু তে সামরিক প্রধান। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করায় চিয়াং 'তৃতীয়' কমিউনিস্ট নিধন অভিযান বন্ধ রাখে। উত্তর-পশ্চিম চীনে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটে।

১৯৩২ মাও-এর কিয়াংসি সোভিয়েতে সাংহাই থেকে চৌ এন লাই, লিউ শাও-চি, পো কু, লো ফু যোগ দেন। এঁরা সকলে পলিটব্যুরোর সদস্য।

১৯৩৩-৩৪ উনিশ রুট ফৌজ চিয়াং-এর দল ছেড়ে লাল ফৌজে যোগ দেয়। চিয়াং 'চীনা সোভিয়েতে'র বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু করে।

হিটলার ক্ষমতায় আসে।

দ্বিতীয় নিখিল চীন সোভিয়েত কংগ্রেসে মাও পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু পার্টি নেতৃত্বের চাপে লাল ফৌজ রণকৌশল বদল করে মারাত্মকভাবে হারে। মূল বাহিনী ও পার্টি সভারা পশ্চিম চীনে পিছু হটে।

১৯৩৫-৩৬ কুয়েই চাও প্রদেশে সুন্‌ই পলিটব্যুরোর সভায় মাও কার্যকরভাবে পার্টি ও ফৌজের নেতৃত্ব পান। এই বছর জুলাইতে চ্যাঙ কুও-তাও ও অন্য কিছু নেতার সঙ্গে মতবিরোধে লাল বাহিনী দুভাগ হয়ে যায়। মাও নতুন ঘাঁটির সন্ধানে দীর্ঘ ৬,০০০ মাইলের লং মার্চ শুরু করেন। পিকিঙেও ছাত্র আন্দোলন জাপবিরোধী স্বদেশি কার্যকলাপ শুরু করে। মাও লাল ফৌজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Red Army University) "জাপ-সাম্রাজ্যবাদকে লড়াই-এর রণকৌশল, ও চীনা বিপ্লবের বিজয়ের রণনীতির সমস্যা" প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন।

১৯৩৬-র ডিসেম্বরে সিয়ানের ঘটনা : চিয়াং-এর এক সেনাপতি স্বয়ং চিয়াংকে সিয়ানে গ্রেফতার করে জাপানের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিতভাবে লড়াই করতে এবং গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেন। ইয়েনানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাপ-বিরোধী সরকারের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৭ জাপানের প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে লাল ফৌজের সংগ্রাম, মাও তাঁর তাত্ত্বিক রচনা 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে'ও 'প্রয়োগ প্রসঙ্গে' এই সময় লিখলেন। সামরিক কৌশলের উপর লিখলেন 'মৌলিক রণকৌশল' ও 'গেরিলা যুদ্ধ প্রসঙ্গে'।

১৯৩৮ যুদ্ধের মধ্যেই কমিউনিস্টদের যুদ্ধকালীন লক্ষ-সমূহ রেখায়িত করেন, 'নতুন অধ্যায় প্রসঙ্গে' 'দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ প্রসঙ্গে', 'জাপবিরোধী গেরিলা যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা প্রসঙ্গে'। মাও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অ-বিতর্কিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৩৯ মাও 'নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে' লিখলেন — যার মূল কথা হল শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্ট এবং পরবর্তী কালের কোয়ালিশন সরকারের মূল কাঠামোর রূপটি। কমিউনিস্ট বাহিনী ও পার্টি সভ্যের দ্রুত প্রসার লাভ।

হিটলার-স্তালিন চুক্তি। জার্মানির পোল্যান্ড



আক্রমণ, দ্বিতীয় ইয়োরোপীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। চিয়াং বাহিনী ইয়েনানের লাল সরকারকে ধ্বংস করার জন্য ব্যূহ রচনা করে।

১৯৪০-৪৪ কমিউনিস্ট-চিয়াং সহযোগিতার সমাপ্তি, লাল ফৌজ দ্রুত গেরিলা অঞ্চল প্রসারিত করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শুদ্ধি — মস্কো-পন্থী ওয়াং মিঙ ইত্যাদিদের বিরুদ্ধে প্রচার। কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 'নয়াগণতন্ত্রে'র ধারণার ব্যাপক প্রসার। কুও মিনতাং-দের যুদ্ধ করার ক্ষমতা ক্রমেই অবসিত। মার্কিন পরিদর্শকদের ইয়েনানের কমিউনিস্ট গেরিলা রাজধানী পরিদর্শন।

১৯৪৫ লাল ফৌজের সংখ্যা ৯০০,০০। জার্মানির পতন। পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েতের প্রবেশ এবং চিয়াংএর সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তি ; মাও লিখলেন, 'কোয়ালিশন সরকার প্রসঙ্গে', মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারলে মাওকে চুংকিং-এ নিয়ে গিয়ে চিয়াং-এর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করান। জাপানে পরমাণু বোমা ফেলা হল — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি।

১৯৪৬-৪৮ কুও মিনতাং ও মাও-নেতৃত্বে কমিউনিস্টদের কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে মতৈক্য হল না, জুন মাসে ('৪৬) দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করলেন মাও। 'বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য' (১৯৪৭) রচনাটিতে কুও মিনতাং-এর বিরুদ্ধে সাধারণ রণনীতি ও রণকৌশল রচনা করলেন মাও।

মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চিয়াং বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় প্রচণ্ডভাবে হেরে যায়।

১৯৪৯ বিজয়ী চীনা গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও-এর নেতৃত্বে পিকিঙে প্রবেশ করেন। চিয়াং তাইওয়ানে পালিয়ে যায়।

মাও লিখলেন, 'গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র প্রসঙ্গে'। ১লা অক্টোবর চীন বৈধভাবে চীনা জনগণের প্রজাতন্ত্র বলে পিকিঙে ঘোষিত হল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে মাও-এর প্রথম বিদেশ যাত্রা — মস্কো। মাও-স্তালিন সাক্ষাৎকার।

১৯৫০-৫৫ চীন-রুশ বন্ধুত্ব চুক্তি। কোরিয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রেরণ, সোভিয়েত সাহায্যে কোরীয়দের সহায়তায় চীন-কোরীয় যুদ্ধ চলে, যুদ্ধে মাও-এর পুত্রের মৃত্যু। স্তালিনের মৃত্যু (১৯৫৩) ও কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি। ক্রুশ্চভের পিকিং সফর, ইন্দোচীনে মার্কিন নাক গলানো। বানদুং-এ (১৯৫৫) আফ্রো-এশীয় উন্নিশটি দেশের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার বিরোধিতা। চীন ও ভারত অন্যতম।

১৯৫৬-৫৭ ক্রুশ্চভের রুশ পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের স্তালিন বিরোধী বক্তৃতা। মাও লিখলেন, 'শত পুষ্প বিকশিত হোক' এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টি বিক্ষুব্ধ বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা আহ্বান করে। প্রকাশিত হল মাও-তত্ত্ব "প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে" — যেখানে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ভেতরে ও পরস্পরের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হল। মাও লিখলেন, "জনগণের মধ্যেকার বিরোধ ও তার সঠিক সমাধান" (১৯৫৭) যেখানে পার্টির মধ্যে ঐক্য-সমালোচনা-ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ নীতির কথা বলা হল। চীন-সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্যে চিড় ধরল।

১৯৫৮ চীনের ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনা, এই সময়ে মাও-এর বিতর্কিত 'মহান উল্লম্ফন' (Great leap forward) পন্থা গৃহীত হল ; তাইওয়ান মুক্ত করার ডাকে চীনে ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধসম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্রুশ্চভের চীনকে নিঃশর্ত পরমাণু অস্ত্র সমর্থন দিতে অস্বীকার এবং মাও চীনা বাহিনীকে রুশ অধিনায়কত্ব রাখতে অস্বীকৃত হন।

১৯৫৯-৬৩ লুসানে চীনা পার্টি সম্মেলনে মাও-এর মত প্রতিষ্ঠার জন্যে তুমুল সংগ্রাম চালাতে হয়। বিজয়ী হয়েও মাও লিউ শাও-চিকে চীনের সরকারের সভাপতি পদ ছেড়ে দেন। দলাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, ভারতের সঙ্গে চীনের মতভেদ। কাস্ত্রো কিউবায় বিজয়ী। চীন থেকে মস্কোর (১৯৬০) উপদেষ্টাদের প্রত্যাহার। চীন ক্রুশ্চভকে প্রকাশ্যে 'শোধনবাদী' বলে ঘোষণা করে। সোভিয়েত ২২তম পার্টি কংগ্রেসে আলবানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ক্রুশ্চভের নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে অতিথি চৌ এন লাই-এর সভা ত্যাগ (১৯৬১)। পার্টি ও রাষ্ট্রীয় স্তরে চীন-সোভিয়েত সংঘাত (১৯৬২), চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ ও চীনের অগ্রসরমান বাহিনীর হঠাৎ-ই আবার বিজিত ভূখণ্ড থেকে একতরফা

পিছু সরে যাওয়া (১৯৬২)। গ্রেট লিপ ফরোয়ার্ডের কিছু অব্যবস্থা ও সোভিয়েত সাহায্য প্রত্যাহারে এবং প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে চীনে প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা। সোভিয়েতকে অস্বীকৃতি জানিয়ে সংগ্রামী আন্তর্জাতিক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যফ্রন্টের আহ্বান জানায় চীন। মাও বিশ্বজনগণকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানালেন (১৯৬৩)।

১৯৬৪-৬৬ চীন-সোভিয়েত সামগ্রিক সম্পর্ক প্রায় শেষ। দু'বছরের ভাল শস্য উৎপাদন। চীন একইসঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। সমগ্র বিশ্বে মাও উল্লেখযোগ্য নেতা হিসেবে স্বীকৃত। চীনের পরমাণু অস্ত্রের আবিষ্কার ও বিস্ফোরণ। ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের তীব্রতা বৃদ্ধি। মাও-এর ঘোষণা সরাসরি আক্রান্ত না হলে চীন আমেরিকার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে যাবে না (১৯৬৫)। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনের সদস্যপদ লাভ। কৃষি, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান — নানা ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি।

১৯৬৭-৭২ মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা। মাও পার্টির ক্ষমতাসীন আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিরোধিতা করে বললেন : সদর দফতরে কামান দাগো ! এই আন্দোলনের লক্ষ্য ব্যাপকতা পেয়ে লিউ শাও-চি সহ পার্টি নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রমণের বর্শামুখ কেন্দ্রীভূত করে। পার্টির মধ্যে সংগ্রাম তীব্রতম হয়। 'পার্টির মধ্যে কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ধনতন্ত্রের পথ অনুসারী'দের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় সারা বিশ্ব হতবাক হয়ে পড়লেও প্রায় সমগ্র বিশ্বে যুবসমাজের ওপর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এক প্রবল প্রভাব পড়ে। চীন এ-বছরে হাইড্রোজেন বোমার সফল পরীক্ষা করে পশ্চিমী শিল্পোন্নত উন্নত প্রকৌশলের অধিকারী দেশগুলির সমকক্ষ বলে প্রমাণ করে। মাও মার্কিনিদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে জানান 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, আপনাদের সংগ্রাম আমাদেরই সংগ্রাম।' সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রায় সমাপ্তি পর্ব (১৯৬৯), নানা গোষ্ঠী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ। রেডগার্ড সংগঠনগুলি কারখানা, খামার, বিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পার্টির নবম কংগ্রেসে লিন পিয়াওকে মাও-এর 'ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও উত্তরাধিকারী' বলে ঘোষণা করা হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতি আবার কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে আরও কয়েক কদম এগিয়ে যায়। 'মাও সে তুঙের চিন্তাধারা'য় মে সেভেনথ্ বিদ্যালয়ে কয়েক লক্ষ ক্যাডারকে শিক্ষা দেওয়া হয়। নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষ। হো চি মিনের মৃত্যু। মাও নেতৃত্বাধীন চীন বিশ্ব রাজনীতিতে পরমাণু অস্ত্রধরদের সমকক্ষ হিসেবে স্বীয় স্থান করে নেয়। ১৯৭০-এ ইন্দোচীনের দেশে দেশে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক বিশ্বব্যাপী ঐক্যফ্রন্টের আহ্বান জানান মাও, বলেন 'একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ রয়েছে এখনও, কিন্তু প্রধান ধারা বিপ্লবের দিকে।'

১৯৭১-এ চীনা রাজনীতিতে দেখা গেল নতুন দিক। মার্কিন সমঝোতার মনোভাবের প্রতি চীনেরও সাড়া দেওয়া, মাও আমেরিকা থেকে কিছু 'বাম, মধ্য ও কেন্দ্রীয়' ব্যক্তিদের চীনে আমন্ত্রণ জানালেন এবং মাও ব্যক্তিগতভাবে প্রেসিডেন্ট নিকসনকেও স্বাগত জানানো বললেন। আমেরিকান কংগ্রেস ১৯৭২-এর মধ্যভাগেই ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সেনা অপসারণের জন্য নিকসনের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে।

১৯৭৩ লিন পিআও-এর পতনের পর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির দশম জাতীয় কংগ্রেসে মাও সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে সকাল ১০ টায় মাও সে তুঙের মৃত্যু হয়।

**তথ্য সূত্র :**


১। চৌ এন লাই-কে কবিতাটি 'মাও সে তুঙের কবিতা সংগ্রহ' (অনুবাদ সুজিৎ ঘোষ) মৈত্রী প্রকাশন, ১৯৯৩, থেকে।

২। Edgar Snow, Red Star Over China, Penguin, 1973.

৩। Edgar Snow, China's Long Revolution, Penguin, 1974.

৪। Han Suyin: The Morning Deluge, Jonathan Cape, 1972.

৫। Han Suyin : Wind in the Tower, Jonathan Cape, 1976.

৬। Great Leader Chairman Mao Will Live Forever in Our Heart : Joint Publishing Co, Hongkong, Sept. 1976.

৭। Selected Works of Mao Tse-Tung : Vol. VI Kranti Publications, Secunderabad, 1990.


# মাও সে তুঙ : শতবর্ষে ফিরে দেখা

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

সময়টা সুসময় নয় নিশ্চয়ই। সাতের দশক পর্যন্তও মাও এবং তাঁর পূর্বসুরি মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন প্রমুখদের নিয়ে কথা না বলাটাই ছিল ফ্যাশন-বিরোধী। আর এখন — এঁদের সবারই যেন মাথা কাটা গেছে। তাঁদের মূর্তির মতোই। অপসারিত হয়েছেন বুঝি এ-যুগের তথাকথিত পরিশীলিত মগজ থেকে। তাই এঁদের নিয়ে বলা-কওয়া হালের ফ্যাশন নয়।

তবুও এই অসময়ে, মাও জন্মশতবর্ষে হঠাৎ বঙ্গভূমি তোলপাড়। এই সেদিনও যাঁরা 'মার্কসবাদী' তাত্ত্বিকরূপে মাওকে আমলই দিতে চাননি, তাঁরাও আজ শতবার্ষিকীতে মেতে উঠেছেন। কোনও এক জবরদস্ত দলের শীর্ষস্থানীয় নেতার কর্মীসভায় দেওয়া ভাষণের নমুনা শুনলাম এক বন্ধুর মুখে : 'আইজ মাও সে তুঙ (অথন মাও জে দঙ না কি যেন হইছে, আমরা পুরানরা মাও সে তুঙ-ই কই) জন্মশতবর্ষ আমাগো কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ— ক্যান ? মনে রাখতে হইব পার্টির রিনিউয়াল আইছে। বিপ্লবটা তো করতে হইব— পার্টি না হইলে চলব ! চাই মাও-গো মতন পার্টি। যে পার্টিটার এক চাষী বৌ-এর বিছানাপত্তর মায় মশারিডা বিপ্লব পর্যন্ত আগলাইয়া রাইখা দিছিল। বিপ্লবের পর পার্টিরে দিয়া আসে। এরেই কয় পার্টির প্রতি দরদ। তাই আজ মাও শতবর্ষ আমাগো কাছে এতডাই গুরুত্বপূর্ণ।''

জানি না এর কতটা সত্যি কতটা মিথ্যে। তবে এ-বাচনের এক-দশমাংশও সত্য হলে একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে কী হচ্ছে বাংলা জুড়ে। আর কেনই-বা, সেটা বুঝে ওঠাও তো খুব একটা কষ্টকর নয়। মরীয়া বামমার্গীরা আজ 'একদা অচ্ছুৎ' মাওকে আঁকড়েই ভেসে থাকতে চাইছে।

এই বাহা। শতবর্ষে অনেক মাও মূল্যায়ন হচ্ছে— হবে। অনেক পণ্ডিত-গবেষক-বাগ্মী আছেন, তাঁরা এসব করবেন। হয়ত তার মধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক, মূল্যবান চিত্রাও আমরা পেয়ে যেতে পারি। আমার মাও-কে মনে পড়া একান্তই নিজের মতো করে। সে মনে পড়াকেই সাধ্যমতো বলার চেষ্টা।

ছোট থেকেই একটা বিষয়ে খটকা লাগত — কেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। কোনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে নামকরণ তো জেনে এসেছি 'নিউটনের গতিসূত্র' বা 'অভিকর্ষতত্ত্ব' বা আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতাতত্ত্ব'। নিউটনবাদ বা আইনস্টাইনবাদ হয়নি। এমনকি হেগেলিয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব — হেগেলবাদ নয়। তবে মার্কস বা লেনিন-এর বেলায় কেন ব্যক্তি নামটাই মতবাদে পর্যবসিত হয় ? ভাল লাগেনি — বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসায় কেন ব্যক্তি 'জীবনের চেয়ে বড়ো' হয়ে ওঠে ? বিশেষত যেখানে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে ব্যক্তির ভূ— স্তালিন' কিংবা 'মহান লেনিন' জাতীয় উচ্চারণ। ফারাক নেই তো কোনও 'মহাত্মা', 'নেতাজি' কিংবা 'কবিগুরুর' সঙ্গে। তাই যখন 'মাও সে তুঙ চিন্তাধারা' কথাটা শুনলাম— বেশ লাগল। যাক অন্তত এক্ষেত্রে মাওবাদ হয়নি।

মাও-কে আমার খুব কাছের মানুষ মনে হওয়ায় কারণ ওঁর বাঁধাগৎ অ্যাকাডেমিক আলোচনার তীব্র অনীহা। বস্তুত যাঁরাই ওঁর Oppose Stereotyped Party writing পড়েছেন, তাঁরাই আমার সঙ্গে একমত হবেন— চিন্তার মৌলিক এবং স্বচ্ছ প্রকাশ মাও-এর বিশেষ গুণ। ভারী ভারী বিমূর্ত তাত্ত্বিক পণ্ডিতির থেকে ওঁর কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল মানুষের কাছে পৌঁছনো। আর সেজন্যেই দুরূহ তত্ত্ব-আলোচনাও মাও-এর প্রকাশগুণে মানুষের মর্মে পৌঁছত।

এত বেশি মানুষী ছিলেন তিনি যে তাঁকে 'অতিমানব' বানানোর প্রয়াস দেখে রীতিমতো কষ্ট হত আমার। যত লেখা ওঁর পড়েছি— অনুবাদে যদিও— বুঝতে অসুবিধে হয়নি লেখার পিছনে মনটি এক চমৎকার রসিক দরদি মানুষের।

আর সব থেকে যেটা দরকারি মনে হয়েছে সেটা ওঁর প্রশ্নমনস্কতা। যে মানসে তিনি বলে উঠতে পারেন— কমিউনিজম কত বছরে আসবে বলা মুশকিল। দশ হাজার বছরও লাগতে পারে। কিংবা — বর্তমান পরিবার প্রথা ভবিষ্যতে কী রূপ নেবে সেটা আগাম বলা যায় না। কারণ এখনও পর্যন্ত পরিবারভিত্তিক সমাজকাঠামোটা মোটামুটি ব্যক্তি-সম্পত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে।

আর তিনি যখন বলেন — কোথায় বুর্জোয়া খুঁজছ ? সে সেঁধিয়ে আছে তোমার পার্টির ভেতরই। কিংবা সদর দপ্তরে কামান দাগো — তখন মনে হয় পার্টিসর্বস্ব যান্ত্রিকতার ঊর্ধ্বে তিনি এক পরিপূর্ণ মানুষ। যিনি চেয়েছিলেন মানুষের উত্তরণ।

আর সেজন্যেই তাঁর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারণা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। ক্ষমতা দখল করলে কিংবা রাষ্ট্র প্রশাসনে কর্তৃত্ব করতে পারলেই যে মুশকিল আসান হয় না তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মাও। কেননা পুরনো সমাজ, তার মানুষজনের তো রাতারাতি একেবারে ভোল বদলে যেতে পারে না। এমনকি তাঁরা যদি পার্টি সদস্য হন তবুও। ক্ষমতার মোহ এবং দম্ভ তাদের মধ্যেও থাকে— তারাও তো পুরনো সমাজেরই মানুষ। তাই আজীবন বিপ্লবী থাকা — পরিবর্তনের পক্ষে, মানুষের পক্ষে থাকার মতো কষ্টকর প্রয়াস আর কিছু হতে পারে না। আর সেজন্যেই প্রয়োজনে 'স্রোতের বিরুদ্ধে' যেতে হয়। পার্টিকেও ঈশ্বর ভাবার কোনও কারণ নেই। প্রয়োজনে তার খোলনলচে পালটে ফেলার দরকার পড়ে।

মাওয়ের এই চেতনা যে কি নিষ্ঠুর বাস্তব তা নিশ্চয়ই আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তবুও অবাক লাগে যখন বহু ব্যবহারে জীর্ণ সেই প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতো বাণীগুলো আওড়ানো হতে থাকে আজও — 'মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান কারণ ইহা সত্য'।

মাও-শতবর্ষে ওঁর প্রশ্নমনস্কতাই মনে পড়ে বার বার। আজ যে ম্যারাপ খাটিয়ে কিংবা বিভিন্ন হলে শতবর্ষে তাঁর পুজো চালু হয়ে গেছে ঘটা করে— এই কি তিনি চেয়েছিলেন ? না কি আজ আমরা কিছু প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসতে চাই — যার অনুসন্ধান ব্যাতিরেকে ভয় হয় পরিণতিতে মার্কস থেকে মাও-এর বস্তুবাদী চেতনা এক কাল্টে না পরিণত হয়।

প্রশ্ন আসে মনে অনেক। মার্কস-বর্ণিত শ্রেণী বিভাজন (যা মূলত পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজ বিকাশের ধারা অধ্যয়নে নির্ণীত) বিপুল বিশ্বের সর্বত্র আজও সমানভাবে প্রযোজ্য কিনা । সমাজ-বিকাশের বস্তুবাদী ধারায় যে পর্ববিভাগ তা কি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার দেশ এবং জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে একইরকম, না এক্ষেত্রে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের নতুন প্রয়োগের অবকাশ আছে। সর্বহারার একনায়কত্বের বাস্তব রূপটি কেমন হওয়া উচিত— এমনই সব প্রশ্ন।

কিন্তু যে প্রশ্নটি এসব প্রশ্নকে ছাপিয়ে যায় তা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব প্রসঙ্গেই। কারণ এই দর্শন-চিন্তার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন-মাও-এর চিন্তার সৌধ। আর সেজন্যেই এই ভিত আজও মজবুত আছে কিনা তা দেখার প্রয়োজন থেকেই যায়।

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি মূল ধারণা — সবকিছুই পরিবর্তনশীল, গতিময় — এমনকি তা যদি বস্তুবাদী দর্শন হয় তাহলেও। বস্তুত সভ্যতার ইতিহাসে বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশও এক পরীক্ষিত সত্য। আমার বিস্ময় জাগে — যখন মনে হয় তবে মার্কসের বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ কেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে ! কেন না লেনিন-স্তালিন বা মাও-এর চিন্তার প্রধানত প্রয়োগ হয়েছে সমাজ বিকাশের প্রশ্নে— ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্ষেত্রে। এটা করার জন্যে যতটা বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োজন-উপলব্ধি, ব্যাখ্যা কিংবা প্রাঞ্জল করা দরকার পড়েছে তা তাঁরা করেছেন। কিন্তু মূল সূত্রগুলির সত্যতা সম্পর্কে তাঁরা প্রত্যেকেই নিঃসংশয় ছিলেন। তাকে যাচাই করে নিয়ে বিকশিত করার তাগিদ তাঁরা বোধ করেননি। লেনিন তাঁর আমলের বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দ্বন্দ্বতত্ত্বের সূত্রগুলির সত্যতা প্রমাণে উদাহরণ হিসাবেই ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু আজও কি আমাদের নিরীক্ষণ ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকবে ! জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে বিপুল অগ্রগতি, 'কসমোলজিতে (মহাবিশ্ববিদ্যা ?) যে আমূল ওলটপালট চলেছে— সেই নিরিখে একবারও কি বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে নতুন করে বোঝবার চেষ্টা করব না ?

বস্তুবাদী দ্বন্দ্বপ্রগতি-চেতনায় বস্তু সর্বদাই গতিময়— কালে এবং স্থানে। তখনও পর্যন্ত স্থান-কালের ধারণা অসীম এবং অনন্ত। কিন্তু আজ স্থান-কালের ধারণা পালটাচ্ছে। হকিং-পেনরোজ গবেষণা আমাদের জানাচ্ছে স্থান অসীম নয়, সসীম এবং কালও অনন্ত নয়— তারও শুরু এবং শেষ আছে। বস্তুত, আয়তনহীন বিপুল ভরসম্পন্ন মৃত নক্ষত্রের অভিকর্ষের টান এমনই যে সেখানে আলো পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যায়— পদার্থ বিজ্ঞানের জানা সূত্রগুলো সেখানে আর কাজ করে না। সময় সেই ব্ল্যাকহোলে স্তব্ধ।

স্থান-কাল এবং বস্তুর অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের ধারণাগুলিকে এই নতুন উপলব্ধির আলোয় আর-একবার খতিয়ে দেখার প্রয়োজন কি পড়ে না ?

'বিগব্যাং' বা 'মহাবিস্ফোরণ'-এ মহাবিশ্বের শুরু এবং 'বিগ ক্রাঞ্চ'-এ এর বিনাশপ্রাপ্তি। কিন্তু বিস্ময়ের কথা সদাপ্রসারণশীল এ মহাবিশ্বের অনেক আগেই 'বেলুনের মতো ফেটে' যাওয়ার কথা। যাচ্ছে না যে তার কারণ যে মাত্রায় প্রসারণ ঘটলে এটা অবশ্যম্ভাবী সেই 'সংকটমাত্রার' ঠিক নীচে এই প্রসারণ হয়ে চলেছে— এ রহস্যের কিনারা আজও হয়নি। 'দুই বিপরীতের ঐক্য ও সংগ্রাম' — দ্বন্দ্বতত্ত্বের এই সূত্রানুযায়ী কি এ-ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় ?

কিংবা কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনিশ্চয়তার নীতি (theory of uncertainty principle) — একটি কণিকার অসংখ্যবার পর্যবেক্ষণে তার যে চরিত্র এবং ধর্ম নির্ণীত হল — কণিকাটির পরবর্তী আচরণে সেসবের লেশমাত্রও না-থাকতে পারে। এ নীতিকে কীভাবে খাপ খাওয়ানো যায় দ্বন্দ্বসূত্রে ?

কিংবা কেওস (chaos) এবং অর্ডার-এর (order)



পারস্পরিক সম্পর্ক। এখন নাকি জ্যোতির্বিদরা মহাবিশ্বে অর্ডার এর পরিবর্তে 'কেওস'-এর আধিক্য দেখছেন।

এইসব আরও অনেক প্রশ্ন থেকেই যায়। এই যে গত পঞ্চাশ বছরে, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে মানুষের চিন্তাজগতের আমূল ওলটপালট — যার ছাপ তার প্রয়োগক্ষেত্রের সর্বত্র। সেই অগ্রগতির ছাপ আশ্চর্যভাবে বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বে অনুপস্থিত। সম্ভবত আজ সব থেকে বেশি দরকারি হয়ে পড়েছে এ-বিষয়ে মন দেওয়া। বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সময়োপযোগী বিকাশসাধন করা। কারণ মার্কস-এর শ্রেণীবিভাজন আজ সেকেলে কিনা এসব প্রশ্ন না তুলেও এই গ্রহের মানুষ যে মোটাদাগের দু-ভাগে বিভক্ত ('যাদের আছে', 'যাদের নেই') এ সত্যকে অস্বীকার করবে কে ? আর 'যাদের নেই' তাদের না থাকাটাও কোনও ন্যায় কথা নয়। সুতরাং তাদের মুক্তির দর্শনকে—বস্তুবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বকে, বিজ্ঞানের মৌলিক অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিকশিত করাই আজ যুগের চাহিদা। সে-কাজকে অবহেলা করে আজ যাঁদের শতবর্ষ-পুজোয় আমরা মাতছি ওঁরা বেঁচে থাকলে এই কাজটাই বেশি বেশি করে করতে চাইতেন।

# অন্যায় বৃষ্টি

আল মাহমুদ

সকালে ঘুম থেকে জেগেই মনে হল আজকের বৃষ্টিটা তোমার জন্য।
জানালার ওপর এই ঝরঝরানি, বাথরুমের পর্দায় বাতাসের হা-হুতাশ
আকাশে জমে থাকা পানির পর্বত আর মেঘের ভেতর বিদ্যুতের ঝলক।
যেন দ্রুত তোমার মুখ, তোমার বুক, তোমার উরুসন্ধির শুভ্রতা
আর ঘোটকীর লেজের মত শ্যাম্পুধোয়া পীতাভ কেশরাশি
এখন অফুরন্ত বৃষ্টি।
আর তোমার নাম শ্রাবণ এবং ভাদ্রকে নিংড়ে
আমার ওপর ঝরিয়ে দিল বাংলাদেশের সহস্রধারা নদী।

আমি এখন কি করি ? কেন আমার প্রভাতে পথহারা ইলিশের ঝাঁক
খুবলে খেয়ে ফেলতে থাকে টেবিলের বই ? জানালার পর্দা
কামড়ে ধরে পালিয়ে যাচ্ছে শুশুকের দল।
দক্ষিণগামী নৌকোগুলো কেন বিনা নোটিশে ডুবিয়ে দেবে তুমি ? কই
আজতো আবহাওয়ায় কোনো পূর্ব সতর্কতার সামান্যতম
সাবধানবাণীও ছিলনা ?
কেন তবে ভাঙা মাস্তুলের গুঁতোয় আমার ফজরের ঘুম ভাঙালে ?

এখন আমার মুখের ওপর ছিন্নপালের ভেজা দড়িদড়া
আর আমার বুকের ভেতর নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে
একটা ঘোলা জলের কালো বোয়াল।

আমি কতবার তোমাকে বলেছি, দ্যাখো আমি বন্যাকে ডরাই।

এবার বর্ষাঋতুর আগেই তোমার কামিজ মেরামত করা উচিত।
চৈত্রে আমার বারণ না শুনে তুমি বৈশাখে
বুকের সবগুলো বোতাম খুইয়ে এলে।
এখন ভরা ভাদ্রে ভয়াবহ বানের মাশুল আমি কি করে
একা উসুল করি ?
এখন আমার সংসারে উপচে পড়া নদীর ভেতর আমি এক
স্মৃতি তাড়িত মহাশোল।

আমার কানকোর ভেতর
জমা হয়ে আছে তোমার নীল যমুনার সবুজ শেঁওলা। আর
বাহিরে ভাদরের অন্যায় বৃষ্টি।

আমি সাঁতার জানি, এই অপরাধে আমাকে কি অকূলে ভাসালে ?
এখন আমি ডাঙা খুঁজে হয়রান।
আমি তৃষ্ণার্ত বলে কি আমার গেলাসে গড়িয়ে দিলে
আস্ত এক মেঘনা নদী ?

এখন আমি জানলাম জলই মানুষের জীবন নয়।

# একটি আত্মজৈবনিক প্রশ্ন

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

নির্ঘাৎ জন্মেছিল একদিন
সে তারিখ নিশ্চিহ্ন, স্বজন পরিবেশ
ছিল কিনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত,
তবু তারে মাতৃগর্ভ করেছে লালন,
পিতৃপরিচয়প্রশ্ন উত্তর পাবে না,
তথাপি জন্মের অনিবার্যতা হয় নি বিস্মিত।
মাতৃস্তন দিয়েছিল কাঙ্খিত পুষ্টি কত দিন
তার সাক্ষী দুর্লভ এখন।
আষাঢ়ের বেহিসেবী ধারা
অযত্নের চারা গাছে সেচন করে যায় জল
কত চৈত্র, কত খরা পার হয়ে
সেই গাছ বাহু মেলে, ছায়াতরু হয়
খুশি করে পথিকের জ্যৈষ্ঠের দুপুরে।
জন্মের তারিখ নেই যে শিশুর
শৈশবের স্নেহের বেষ্টন সে পেয়েছে নিশ্চিত
অস্তিত্বই সেই ঘোষণা।
প্রথম যৌবনে
ক্ষুধা ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, ক্লান্তি ছিল দেহে
মড়ার মতন ঘুমে কত রাত গেছে কেটে ;
কাটেনি দারিদ্র্য বঞ্চনা অনিশ্চয়
রাতের কুকুরের মতো আর্ত চীৎকারে
রেখেছিল ঘিরে।
লাঞ্ছিত যৌবন অপমানে নত শির
প্রাণ তার প্রায়শ্চিত্ত করে নি কখনো,
প্রতিদিন দাম শুনে বেড়েছে যৌবন
লজ্জা স্বপ্ন ভয় পর পর ছেড়ে গেছে
তবুও ছাড়ে নি প্রাণ।

পায়ে পায়ে কাটা পথে কোনো এক ধারে
ফুলহীন নিষ্ফলা গাছ যেন
ছন্দোহীন শোভাহীন
তবু প্রতিটি ফাগুনে কিশলয়ে সূর্যসাক্ষী
বাঁচার মন্ত্রে হয়েছে উজ্জ্বল।

মরে নি মরে না এরা
চোখেও পড়ে না
ফুটপাথে পথের আড়ালে
কাটা ফসলের আলপথে বেওয়ারিশ মাঠে
প্রাণের উদ্ভিন্ন শক্তি
অমোঘ ঘোষণায় চির প্রতিষ্ঠিত।

প্রাণের নিঃসঙ্গ অপিচ অনর্থ সাধনা
মানুষের মনে তবু আনে না বিস্ময়
এই প্রশ্ন অতীব জরুরি।

# কুহক

**মঞ্জুষ দাশগুপ্ত**

একটুখানি এগোয় যদি পিছিয়ে পড়ে বেশি
নরকটানে হৃদয় লোভী এবং এলোকেশী
সোনার গুঁড়ো বিছিয়ে দিয়ে অর্ফিয়ুসের কানে
সন্দেহকে জাগায়, সে তো জাগিয়ে তোলা জানে।

চিরকালীন মানুষ চলে পূর্বদিকে মুখ
অস্তগামী সূর্য থাকে পশ্চিমে উৎসুক ;
পায়ের উপর লুটোয় শাল ছায়ার মায়ালতা
আকাশে দূরে ফুটতে থাকে মানুষী মূর্খতা।

অপমানের লাক্ষা দিয়ে তৈরি করা ঘর
ক্রোধের কণা স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা থরথর ;
নতুন লালন বলতে পারে আরশি নগরে যে
অসহিষ্ণু পড়শিরা সব দিব্যি বসত করে।

'আগান কত্তা আগান দেহি আপনে কি থুথুরা !
মুখ থুইবড়া পইড়া গেলেন অশ্বমেধের ঘুড়া !'

# প্রবাসে তোমার ঠিকানা

**অসীম রেজ**

শহর প্রবাসে আছি,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সবকিছু,
চটি জোড়া, হাতঘড়ি, চশমা, সুগন্ধি রুমাল,
রুপোলী বোতামের আঁশ ফুল,
একগুচ্ছ হাসনুহানা,
দেওয়ালে ইউক্যালিপটাসের ছায়া বেড়েছে ক্রমশ,
অবিকল তোমার মুখের আদল ;
হাতব্যাগের ভিতর ঢোকানো খুচরো পয়সা, বাসের টিকিট,
এক টুকরো কাগজে ঠিকানা লেখা
তোমার দেওয়া ডাইরীর শেষ পাতায়
কবিতা জমেছে রোজ বরফের মতো।
এ শহরের আমি কেউ নই,
অন্যেরা আমারই মতো কেউ কেউ প্রবাসী, একা,
এ শহর তুমি ছেড়েছ বহুদিন,
চৌমাথার মোড় জনশূন্য, খাঁ খাঁ,
বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে দেখি তোমার মতো কেউ
চলাফেরা করে, কথা বলে, অন্যমনে হাঁটে,
কত নম্বর বাড়ী ছিল তোমাদের, কী রঙের,
কি যেন নাম ছিল ইত্যাদি, ইত্যাদি,
ভাবতে ভাবতে আমি হন্যে হয়ে ঠিকানা খুঁজি
অন্ধকার গলির ভিতর গলি মিশে যায়
অস্পষ্ট সব দেওয়াল লিখন।
কী ভীষণ পাল্টে গেছে সব,
তোমার বাড়ীর আধখানা কোথায় গিয়েছে,
জানলা, দরজা, সিঁড়ি কোথায় লোপাট,
ছাদের উপর সেই মাধবীলতা আর চোখে পড়ে না কখনও।
সারাদিন এইভাবে এলোমেলো ঘুরে
মধ্যরাতে ঘরে ফিরে দেখি
কী আশ্চর্য ! আমার স্মৃতিতে নেই,
আমারই বাড়ীর পাশে তোমার ঠিকানা লেখা,
অতি পরিচিত সে বাড়ী
তুমি পাল্টেছ বহুদিন।

## আলোকিত তিনটি পলক

**সুমন গুণ**

১

কত সমারোহ তুমি এই মৃদু স্বভাবে গোপন
রেখেছ জানিনা, তবু মাঝে মাঝে হঠাৎ গভীর
মেঘের আভাস পাই, মনে হয়, মুগ্ধ চরাচরে
কাশের সমস্ত গুচ্ছ একই অভিপ্রায়ে দুলে ওঠে।

২

ব্রতের দুপুরে তুমি আঁচলের বিনীত মুদ্রায়
সামিলে বসেছ, চারপাশে গোল হয়ে আছে
কামনার বিভিন্ন বয়স, আলোকিত গল্পের মতন
ভবিষ্যৎ ভরা থাক অবিরল শস্যে, সমাদরে।

৩

এখনো স্মৃতির ধ্বনি মাঝে মাঝে বিপন্ন পলক
অন্য রঙে ভরে দেয়, মনে হয়, আশ্চর্য কুসুম
কিছু কিছু গাছে ফুটে উঠেছিল, তার
কৃতার্থ সুবাসে ভরে যাবে মাস, আগামী বছর।

## মণিমালা বলছি

**ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়**

দাদা, তুমি শোন,
তোমার মণিমালা ভাল আছে,
তোমার আদরের ছোট বোন
এখন একটা গোটা পরিবারের নতুন গৃহিণী।
আজন্মের চেনা পরিবেশকে
নতুন জীবনের সন্ধানে
ছেড়ে এসেছি,
হয়ত কিছুটা বা নিশ্চিন্ত করেছি তোমাদেরও।
এই ঘরের আসবাবগুলোর মত
আমার সব কিছু এখন
নতুন, আনকোরা ;
তবু এক একদিন দুপুরের মেঘলা নির্জনতায়
হঠাৎই মনে পড়ে যায়
আমার সেই ছোট্ট ঘরে ছেড়ে আসা হার্মোনিয়মটাকে।

মনে পড়ে যায়
আমার সেই পুরনো ড্রেসিং টেবিল,
মরচে পড়া বইয়ের র‍্যাক,
ছেড়ে আসা আরও কত কিছু।
দাদা, আমার জিনিষগুলো
এখনও কি সেইরকম আছে,
না কি ধূলো জমেছে তার ওপর ?
আমার নতুন আলমারী ড্রেসিং টেবিল
ঝাড়তে ঝাড়তে
রোজ এমন মনে পড়ে কত কিছু।

বাবা কি এখনও
বিকেলে বারান্দায় ব'সে সূর্যাস্ত দেখেন
একা একা,
কেউ কি পিছনে দাঁড়িয়ে
তাঁর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ?
দাদা, একদিন এসো,
দেখে যাও তোমার ছোট্ট মণি
কেমন নতুন গিন্নী হয়েছে।
তোমাকে দেখাব
আমার নতুন গৃহসজ্জা,
খাওয়ার নতুন শেখা রান্না।

# ‘জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়’ : গোপাল হালদার

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপনারাণের কূলে শতাব্দীর প্রথম দশকে যে নবজাতক প্রথম চোখ মেলেছিল, শতাব্দীর নবম দশকে কলকাতার শত ঋবিরোধে খণ্ডিত জনসংঘটের মধ্যে তিনি চোখ বুজলেন। ইতিমধ্যে অধ্যায় থেকে অধ্যায়ান্তরে রূপান্তরিত হয়েছে পৃথিবী, সেই চলিষ্ণু সত্তার দৃষ্টির সামনে। ইনি গোপাল হালদার। ভাষাতত্ত্বের ছাত্র, পৌঁছে গিয়েছিলেন মার্কসবাদে, হয়ে পড়েছিলেন সংস্কৃতি পারমবাদী। শিকড়ে শিকড়ে বাঙালি — পাতায় পাপড়িতে বিশ্বাকাশের আলো খুঁজে ফেরা। Thy Hand, Great Anarch নামে বিখ্যাত গ্রন্থে নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছেন —

> His name was Gopal Haldar. He was a contemporary of Sajani Das, who had introduced him to me. He was a student of philology had come to Calcutta to become a writer, and perhaps also with political ambition after giving up his lecturership in Feni College. At that time he was completing a thesis on a dialect of the Bengali language, and was also looking after a monthly magazine edited by Ashoke Babu. For our magazine he had written some witty articles, and I found him to be a very quiet and level headed young man. But he was already involved in some way with the revolutionary movement. Later he was detained without trial. Finally he became a Communist and after independence a member of the Bengal legislature. He published some books and was respected as a writer in Bengal.

এত সংক্ষেপে, কিন্তু এত মনোজ্ঞভাবে নীরদবাবু শ্রী হালদারের জীবনীচিত্রটি উপস্থাপিত করেছেন যে, এরপর আর কিছু বলার থাকে না। শুধু একটা কথাই বলার থাকে ‘শান্ত’ এই বিশেষণটিতে যেন শ্রী হালদারের চলিষ্ণু জীবনধর্মের মূল কথাটি চাপা না পড়ে। অথচ কাছ থেকে যতবার মানুষটিকে দেখেছি, ততবার ‘শান্ত’ এই বিশেষণটি অপরিহার্য মনে হয়েছে। নীরদ সি. চৌধুরীর কথা থেকেই বোঝা যায় শ্রী হালদার এক বিচিত্রপ্রভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী সংস্কৃতির অকৃত্রিম বন্ধু, ভাষাতত্ত্বের অভিনিবিষ্ট গবেষক, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কীর্তিমান এবং সর্বোপরি বাংলা কথাসাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিক শ্রী হালদার আজ প্রয়াত। তিনি কতটা স্মৃতিবিহারী আমরা তা জানি না। কিন্তু তাঁকে ঘিরে আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্বতঃই গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। ‘একনা’র গোপাল হালদার অথবা ‘সংস্কৃতির রূপান্তরে’র গোপাল হালদার — চারের দশকের গোড়ার দিকে সকলের পরিচিত ‘গোপালদা’র এই ছিল প্রধান বৌদ্ধিক পরিচয়। ‘বৌদ্ধিকতা’ শব্দটি ব্যবহারে একটু সঙ্কোচ বোধ করছি — কেননা শব্দটির অনুষঙ্গে জড়িয়ে থাকে উদ্দণ্ডশলা সজারুর সন্ত্রাস। গোপাল হালদারের প্রীতিস্নিগ্ধ মানবিক হার্দ্য সংস্পর্শে একবারও যিনি এসেছেন, তিনি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হবেন — মেধা, মন, বৈদগ্ধ্য সবই এখানে সার্থক হয়েছে গতিশীল সজীব মনের কারণে।

সেই সঙ্গে অবশ্য উল্লেখ্য তাঁর সহৃদয়তা, তাঁর বিদ্যোদ্ভূত বিনয়। কোনও কারণে আমার নৈহাটির বাসগৃহে তিনি প্রায় একদিবস অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সেই সুস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের আভা আজও আমরা স্মরণ করি। তিনি বিদায় নেবার পর আমার স্ত্রী, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ একবাক্যে বলেছিলেন — ‘একজন যথার্থ বাঙালি’। তারও বেশ কিছুদিন আগে ভেরা নভিকোভার সঙ্গে এক দুপুরে এসেছিলেন আমাদের গৃহে। আমার মা-ও একই কথা বলেছিলেন। গোপালদার একখানি চিঠি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না।

C.I.T Building
Bloc H. south 19,
Cal - 14
২৩.২.৭৪ ইং

সুহৃদ্বরেষু

১১ই ফেব্রুয়ারী পাটনায় ছিলাম ও ১৯শে সন্ধ্যায় এখানে ফিরে আপনার পত্রখানা পেলাম। ধন্যবাদ দেব না। নিজের ভাগ্যকে নেহাৎ মন্দ বলতে পারব না। এত দিন যে আমি বাঁচব তা আমার বাবা-মাও আশা করবেন না। হাজার হোক, বাঁচাটাও মন্দ ব্যাপার নয় — There is a joy in mere living. তা “mere” হয় নি — বোধহয় কখনো সত্যই হয় না, বড়-ছোট এত বন্ধুবান্ধবের প্রীতি ও স্বচ্ছন্দ ও সকৌতুক সাহায্য আমি পেয়েছি যাতে বারে বারে মনে হয়েছে The poetry of earth is never dead, এ যেমন সত্য, পৃথিবীতে love of friendsও তেমনি এক inexhaustible source. অন্তত আপনাদের ভালোবাসা আমাকে এ বিশ্বাস জুগিয়েছে যাতে এ দিনেও মানুষে বিশ্বাস একেবারে হারাই না। সানুজ সপরিবারে আমার ভালোবাসাও আপনারা সকলে গ্রহণ করুন এই নিবেদন।

বঙ্কিম উপন্যাসখণ্ড বেরিয়েছে — আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না। প্রকাশ মাত্রই আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। ফিরেছি ৩/২/৭৭এ। তারপর আবার ৯/২/৭৭এ পাটনা যাই। বঙ্কিম এ খণ্ডেরও ‘ভূমিকার’ যা মাজা-ঘষার ইচ্ছা ছিল তা সম্ভব হয় নি। প্রুফ দেখারও সুযোগ পাই নি। প্রকাশকদের বড় তাড়া। তবু যা বেরিয়েছে তা যদি আপনি একবার পড়ে কিছু মতামত (এবং দোষত্রুটিও) জানান, তা হলে আনন্দিত হব।

বাংলাদেশে আমাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা উপন্যাসের ভূমিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। প্রধান ভিত্তি ছিল আপনার বই। ও কার্তিক লাহিড়ীর কিছু লেখা। রাজশাহীর কর্তৃপক্ষ বক্তৃতাগুলি ছাপবেন। প্রেস কপি তৈরী হলে একবার আপনাকে আবার জ্বালাতন করতে আসব। অবশ্য কপি তৈরী করতেও দেরী হবে।

মার্চ মাসটা পাটনায় একটু বিশ্রাম করতে চাই। বাংলাদেশে ওদের শিক্ষিত সাধারণ প্রচুর উৎসাহ দেখান : আমিও সেই ১৯৪১-৪২এর দিনের মত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তাদের কথা রাখি — বক্তৃতা, গল্প, আলোচনা কিছুই বাদ যায় নি। তাতে শরীর একটু বেশি শ্রান্ত হয়েছে, তা পরে দেশে ফিরে বুঝতে পারি। একটু বিশ্রাম নেবে।

আমার প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি
শুভার্থী
গোপাল হালদার।

শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
করকমলেষু —

উদ্ধৃত পত্রটি থেকে বোঝা যায় গোপাল হালদার শুধু বিদ্বজ্জনই ছিলেন না, ছিলেন প্রকৃত অর্থে এক সজ্জন। তাঁর সৌজন্য অবশ্যই কখনও নিরপেক্ষতার জন্য বৃথা তৎপর ছিল না, কিন্তু তাঁর দায়বদ্ধতাও কখনো উদ্ধত পক্ষপাতে কর্কশ হয়ে ওঠেনি। আড্ডা সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত লেখা কে না পড়েছেন — তাঁর আড্ডায় যাঁরা বসেছেন তাঁরা জানেন, চকিত মন্তব্যে, প্রসঙ্গ আকৃষ্ট গল্পে তিনি কেমন সমাবেশকে হাস্যে উতরোল করে তুলতে পারতেন। সে অনেক দিনের কথা। ‘পরিচয়’ অফিসে গোপালদার সঙ্গে আমাদের গল্প হচ্ছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কোনও একটি কমিটিতে তাঁর সঙ্গে ঠিক সমঝোতা হচ্ছিল না। নিত্যই তাঁকে ভোগ করতে হচ্ছিল নানা সমালোচনা ও অভিযোগ। দীপেন্দ্রনাথ — বললেন আপনি কমিটি থেকে সরে আসছেন না কেন? গোপালদা বললেন — ওঁরা আমাকে ছাড়বেন না। আমরা বললাম — সে আবার কী? গোপালদা বললেন — ‘একবার আমি আর অমরেন্দ্রপ্রসাদ ট্রেনে নৈহাটি যাচ্ছি। দমদমে এক মাতাল উঠল। সে আমাদের সামনে বেঞ্চে বসে অকারণে আমাদের গালাগাল দিতে শুরু করল। বেলঘরিয়া অবধি গালাগাল সহ্য করে আমরা ঠিক করলাম আগরপাড়ায় নেমে কামরা বদল করব। যখন আমরা নামতে যাব, তখন সেই মাতাল আমাদের নামতে দেবে না। বলছে — একী আপনারা নেমে যাচ্ছেন যে, আপনারা নেমে গেলে আমি গালাগাল দেব কাকে?’ আমরা পয়েন্টটা বুঝলাম। ভেরা নভিকোভা নৈহাটির গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে নদীর জল দেখে বললেন — জল একটু ঘোলা। গোপালদা বললেন — ‘আমরা জল ঘোলা করতে ভালবাসি’। আমার মনে হয়েছে যে, তাঁর সদাপ্রসন্ন মানসিকতাই ছিল তাঁর বড় সম্পদ। সকলেই জানেন, তিনি বরাবর এ্যালার্জিক রাইনাইটিসে ভুগেছেন। এ নিয়েও তাঁর রসিকতাটি উপভোগ্য — ‘আমি হাঁচি এবং আমি বাঁচি’।

আমি বর্তমান প্রবন্ধে তাঁকে সংস্কৃতি পারমবাদী বলেছি। চরৈবেতি মন্ত্রে তিনি ছিলেন দীক্ষিত। তিনি জানতেন সংস্কৃতির রাজ্য সীমান্তবিহীন। ইংরেজির ছাত্র, নোয়াখালি উপভাষার তথ্যসন্ধানী, অগ্নিযুগের কর্মী, সুভাষচন্দ্রের সহযোগী, সাম্যবাদে দীক্ষিত গোপাল হালদারের অভিধানে থামা বা ক্ষান্তি বলে কোন শব্দ ছিল না। দীর্ঘকাল ‘পরিচয়’ সম্পাদনা তাঁর বহুধাবিস্তারিত কর্মধারার ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট অধ্যায়। বর্তমান প্রবন্ধ লেখক আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন যে গোপাল হালদারই তাঁকে ‘পরিচয়’-এ গ্রন্থ সমালোচনা কর্মে ডেকে নিয়ে প্রণোদিত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমি যে তাঁকে সংস্কৃতি পারমবাদী বলেছি তা অকারণ নয়। বলা দরকার সংস্কৃতির রূপান্তরের পর্যবেক্ষণে, বাঙালি সংস্কৃতির রূপরেখা রচনায় তাঁর যে ইতিহাস চেতনার পরিচয় আমরা পাই সেখানে তাঁর পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথ ও নীহাররঞ্জন। কোশাম্বী অথবা রাহুলজির মতোই তিনিও বাঙালির ইতিহাসকে দ্বন্দ্বমুখ ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাঁর মানসপুত্র অমিতও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সেই দীক্ষায় অহরীন পথ চলাকে জেনে নিয়েছিল গভীর জীবনযাপনের প্রধান শর্ত রূপে। সুপার স্ট্রাকচারকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি মৃন্ময় ও মাটির গঠন বিশ্লেষণ করতে ভোলেননি। নীহাররঞ্জন যেখানে তাঁর গ্রন্থ শেষ করেছেন —

উপন্যাসে ও গদ্যগ্রন্থে গোপাল হালদার তাঁর পরের কালের বাঙালি জনমানসকে তাঁর বিজয় করে নিয়েছিলেন।

আজ তাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রেক্ষাপটে একথা আমাদের ভাবনাকে আকর্ষণ করেই যে তিনি আসলে ঔপন্যাসিক। এবং এটাও লক্ষণীয় যে সততসজাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টির জন্য তিনি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস অপেক্ষা দীর্ঘ বিস্তৃত ট্রিলজি রচনায় মনোযোগী ছিলেন বেশি। 'রাস্তার রাজা'র মতো মোক্ষম ছোট গল্প তিনি লিখেছিলেন বটে, এমন কি মনীষাভাতি স্নিগ্ধ প্রেমের গল্পও তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর শৈল্পিক অভিপ্রায় বিস্তারে এবং বীক্ষণে বৃহত্তের অভিমুখী হয়েছে বারে বারে। সহজ সিদ্ধি অপেক্ষা দুরূহ সাধনায় যেমন নিবেদিত ছিল তাঁর জীবন, তাঁর শিল্পসাধনাও ছিল সেই জীবনসাধনার সঙ্গে অন্বিত। 'একদিন - অন্যদিন - আরেকদিন', 'উনপঞ্চাশী - পঞ্চাশের পথ - তেরশ পঞ্চাশ' 'ভাঙন - ভাঙনী কুল - নবগঙ্গা' এবং 'জোয়ারের বেলা-স্রোতের দীপ-উজান গঙ্গা' — এই সব মহোপন্যাস প্রমাণ করে তাঁর ঔপন্যাসিক অভিপ্রায়ের স্বাতন্ত্র্যকে। মহা-মন্বন্তরের পটভূমিকায় বিশাল বাঙালি সমাজের ঘাত প্রতিঘাতে, অথবা ভাঙন-ট্রিলজিতে ইতিহাসের অমিত্র অক্ষর পয়ারকল্প জীবনছন্দকে ধরার প্রয়াসে গোপাল হালদার প্রমাণ করেছেন যথার্থ উপন্যাস রচনা বুদ্ধিস্বচ্ছ এবং কল্পনাসক্ষম ব্যক্তিকেই মানায় ভাল — নির্বোধ লাইব্রেরিবিহারীর কাছে তা বিড়ম্বনা মাত্র।

সে হল সেই ত্রিশের দশক — শরৎচন্দ্রের একটা উত্তরাধিকার তখন প্রবলতর হয়েছে — লোকযাত্রার অভিজ্ঞতাকে কথা-সাহিত্যে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রসঙ্গত মনে রাখি 'লোকযাত্রার অভিজ্ঞতা' শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দবন্ধ। ত্রিশের দশক — লোকজীবনের অন্তরের পরিচয় খুঁজে পেতে গিয়েই বাঙালি ঔপন্যাসিক সযত্নে প্রকৃতিবাদের প্রলোভন থেকে আত্মরক্ষা করলেন। ত্রিশের দশক — তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তন্ময় জগৎ ধীরে ধীরে আমাদের কাছে স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে উঠছে। ঠিক এমন সময়ে প্রকাশিত হল গোপাল হালদারের 'একদা'। 'একদা' সর্বার্থে ও শ্রেষ্ঠার্থে অনন্য উপন্যাস। এরই অনুবর্তী রচনা — যদিও কালের দূরত্বে ব্যবহিত, 'অন্যদিন', 'আর একদিন'। সময়ের সংঘাত ও অভিঘাতে শিল্পপ্রাণ ও সংস্কৃতিমনস্ক গোপাল হালদারের পথ চলা। পথ অথবা নদী অথবা কালপ্রবাহ ইতিহাসসজাগ এই লেখকের নির্ভুল অভিজ্ঞান। আর সকলের সঙ্গে এইখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। মানুষকে তথা আজকের ব্যক্তিচরিত্রকে তিনি ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের যান্ত্রিক ছকে ফেলে নির্মাণ করেননি। তিনি শুধু এই কথাটা বুঝে নিয়েছিলেন, কোনও ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন নয়। অনন্বয় মানুষকে গ্রাস করতে চাইলেও ব্যক্তি সম্পর্কময়। শত বন্ধন জাল জটিল এবং সহস্র সম্পর্কে গ্রন্থিল ব্যক্তিমানস। ফ্রয়েডিয় কূট গূঢ়ৈষণায় মানুষের সমগ্রতাকে তিনি খুঁজলেন না। সমগ্র মানুষকে তিনি খুঁজলেন সেই ব্যক্তির চিন্তনে। ব্যক্তির চিন্তায় প্রতিবিম্বিত বাইরের ইতিহাসের, সমাজ ও সংসারের, জগৎ ও জীবনের চলচ্ছন্দ। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে এইখানে তাঁর মিল। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে বিপুল অমিল এইখানে যে তাঁর চরিত্রেরা — প্রধান চরিত্রেরা অন্তরজীবী। বুদ্ধির নিয়ত চর্চায় তাদের বিকাশ। পক্ষান্তরে গোপাল হালদারের চরিত্রদের মনোময়তা তাদের কর্মিষ্ঠ চলিষ্ণু স্রোতে আবর্তিত হতে হতে পরিণামমুখী। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'উনপঞ্চাসী' 'পঞ্চাশের পথে' ও 'তেরশ পঞ্চাশ'-এর বিনয় চরিত্রের কথা এখানে উল্লেখ্য। বিনয় 'পঞ্চাশ' ট্রিলজির এমন একটি চরিত্র যার মধ্যে হয়ত লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নানা মাত্রা একত্র হয়েছে। বিনয়কে দিয়ে লেখক এই উপন্যাসে গ্রাম-নগরের দুই বৃত্তকে যুক্ত করেছেন। বিনয়কে তিনি তাঁর বাস্তব ভাষ্যকার রূপে উপস্থাপিত করে উপন্যাসে এনেছেন বৌদ্ধিক বিস্তার — অসংখ্য চরিত্র, বহু ঘটনা বৃহদায়তন রুশ উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পূর্ববর্তী উপন্যাস, 'একদা'র প্রকাশ ১৯৩৯-এ, 'অন্যদিন'-এর প্রকাশ ১৯৫০-এ, 'আর একদিন' বেরিয়েছে ১৯৫১-তে। 'একদা'র সঙ্গে অনুবর্তী দুটি বইয়ের প্রকাশকালের ব্যবধান এক দশকেরও বেশি। আঠাশে অঘ্রাণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের আহ্নিক আবর্তন প্রথম বইটিতে ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বইটিতে যে কালখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে তা এর আট বছর পরের একদিন। তৃতীয় গ্রন্থে সময় আরও এগিয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তিনটি দিন ব্যক্তি অমিতের জীবনে যেন তিনটি মাইলস্টোন। 'অমিত' এই নামরূপটি আমাদের নাড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের নায়ক অমিত যেন প্রকারান্তরে এ কথাই বলে, কোনও ছকে তাকে মাপা চলবে না। বর্তমান ত্রয়ী রচনার অমিত নিশ্চয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সে জাতীয় অভিজ্ঞানের সন্ধানী নয়। সে জানে তার অনুভূতির অমেয়তা। অমিতের জন্যই এ উপন্যাস বিশিষ্ট হয়ে উঠল — উপন্যাসটি হল এ নভেল অফ্ সাবজেক্টিভিটি, বা মন্ময়তার উপন্যাস। 'অমিত চরিত্র' বলতে এ উপন্যাসে আমরা যা পাব তা অন্য উপন্যাসের মতো অ্যারিস্টোটলীয় চরিত্রকল্পনা নয়। এখানে 'চরিত্র' কথাটারই কোনও মানে হয় না। ঘটনার কষ্টিপাথরে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা বা চরিত্রের সক্রিয়তার মাধ্যম হিসাবে ঘটনাকে উদ্ভাবনও এ উপন্যাসের কাজ নয়। এ উপন্যাসে আমরা যেটা পাব সেটা হল অমিতের মানসিক বাতাবরণ। তাহলেও এই উপন্যাস লিখিত হয়েছে যদিও প্রথম পুরুষে — তথাপি বোঝা যায় 'অমিত' একটি উত্তম পুরুষেরই নাম। 'অমিত' নামকরণে লেখক নিজেকে বিযুক্ত করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তা, চেতনা, ভাবুকতার নামই অমিত। আমরা 'ত্রিদিবা' উপন্যাসে সেই অমিতের মানসিক



বাতাবরণকেই অনুভব করব। অমিতের তিনটি দিন দেখতে দেখতে হয়ে ওঠে বাঙালি মধ্যবিত্তের দুই দশকের অন্তর্গতি ইতিহাস।

অমিতের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন 'ত্রিদিবা'র প্রধান কথা — এ বললে উপন্যাসটির গুরুত্ব অস্বীকার করা হয়। তার চেতনা গভীরের দিকে কেমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেটা এ উপন্যাসের আসল কথা এবং সেই আসল কথাটিকে মনে রেখেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের দুই দশকের রূপান্তর ভাঙন গড়নের ইঙ্গিতটি এ উপন্যাসে ধরা পড়েছে। সুরবালার মেয়ের গল্প অনেক গল্পের মধ্যে তার একটা বড় প্রমাণ। বর্তমান লেখক 'ত্রিদিবা'র তিনখানি বইয়ের ভাবসত্তার দিকে তাকিয়ে অমিতের জীবনের তিনটি অধ্যায়ের কথা ভাবেন। সংশয়সমীক্ষা, উপলব্ধি এবং উত্তরণ। সেদিক থেকে 'একদা' অংশে অমিতের প্রধান পুরুষার্থ হল প্রস্তুতিঘন মানসিকতার দিকে যাত্রা। 'একদা'র যেখানে শেষ সেখানে বিদেশি শাসকের পুলিশবাহিনীর সবুট পদধ্বনিতে অমিতের পর্বান্তরের আহ্বান। 'অন্যদিন'-এ 'একদা'র মর্মী মানুষ কর্মী জীবনে দীক্ষা পেতে চলেছে। উদাসীন নিরাসক্তি থেকে সে বেরিয়ে এসেছে। 'আর একদিন-এ অমিত পুরোপুরি ইতিহাসের মানুষ। একথা কোনদিন কোনও মার্কসবাদী বলেনি যে, শ্রমিক শ্রমিকই থেকে যাবে আর ভদ্রলোকেরা তক্‌মা-তাবিজ ছিঁড়ে শ্রমিকদের জীবনে ভিড়ে যাবে।। শ্রেণীবিভক্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ মাত্রেই সমাজ-প্রদত্ত বিকারগুলির ফলে নানাদিক থেকে অনন্বিত। মার্কসবাদ শেখায় দূর করতে গেলে সেই অনন্বয়, কর্মিষ্ঠ আততিতে অর্জন করতে হবে সঠিক সংজ্ঞার্থের মনুষ্যত্ব।

অমিতের বৌদ্ধিক পরিবর্তন ও চেতনার দৈগন্তিক বিস্তারের আরেক সাক্ষ্য তার সেক্সপিয়ার পাঠ। ট্র্যাজিক নায়ক যেমন বিষ্ণু দে-র অমর কবিতা 'এল্‌সিনোরে'-তে হয়ে ওঠে কর্মে প্রেমে সমুদ্যত এক ব্যক্তিসত্তা, অমিতের সেক্সপিয়ার পাঠে তেমনি অর্জিত হয় ইতিহাসের পথে বেরিয়ে পড়তে চাইছে এমন এক নায়কপ্রতিমা। একটা কথা তোলা যায়, অমিতের intense living -এর স্বরূপটা কী ? এর উত্তর আমরা অমিতের কাছ থেকে পাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

> কোথায় তোমার পরিচয় অমিত ? জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেমমণ্ডিত গৃহরচনায়, ধ্যানসুন্দর প্রীতিসুন্দর গোষ্ঠীরচনায়, একান্তে বসিয়া আত্মরচনায়। জ্ঞানে, চিন্তায় ভাবনায় কাব্যে কলায় শিল্পে কোথাও আর কোনো পরিচয় নাই তোমার। পৃথিবীর চোখে তাই তুমি ব্যর্থ, বিক্ষিপ্ত। অথবা মানুষের এই মহদভিযানের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াই সার্থক তুমি।

এভাবেই সে ছোট থেকে বড় আমিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু ইতিহাসেরই কঠিন নির্দেশে ভারতবর্ষে ইংরেজের কলোনির মধ্যবিত্ত স্বপ্নে ও পুরুষার্থে নানা ভাঙচুর — 'আগামী কাল বুকে তাকায়' সেখানে বাস্তবমত্তা ? সেজন্যই অমিতের তিনটি দিন অনন্তের নিজস্ব স্বাক্ষরে মুদ্রিত। সে যুবকের লক্ষ্য ছিল সামনে। ভাঙতে ভাঙতে গড়তে হয় এ তো সমাজবিপ্লবের তত্ত্বে দীক্ষিত ব্যক্তির উপলব্ধ শাশ্বত ইতিহাসসত্য। ব্যক্তির জীবনে তার অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। ব্যক্তিকেও এগিয়ে চলতে হয় ছোট আমির নানা আবরণ ছিঁড়তে ছিঁড়তে। এটা শুধু তার বৃহত্ত্বকে অর্জন করার ব্যাপার নয়। নিজ ভূমিকাকে নির্ভুল করে তোলার ক্লান্তিহীন প্রয়াস সেখানে আসল কথা। চিন্তাবিলাসী বিশ্ববিহার এক প্রকারের পলায়ন। এখানে সে প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হল বিশ্বকে নিজের মধ্যে আহ্বান। সে অনন্বয়ের তাড়নায় যখন আমরা বলে ফেলতে চাইছিলাম — যা একান্ত ব্যক্তিগত তাই পবিত্র, সে সময়ে অমিত বলতে চেয়েছে উল্টো কথা। আমরা এখানে শঙ্খ ঘোষের বোধভূয়িষ্ঠ 'ত্রিদিবা' আলোচনা থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি —

> যখনই কোনো কাজের দায়ে এসে পৌঁছই আমরা, তখনই বুঝতে পারি যে, নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নেওয়াই হল আমাদের প্রধান এক সমস্যা, কেননা সকলের সঙ্গে মিলবার পথে আমাদের অহংই হয়ে দাঁড়ায় বড়ো বাধা। আত্মসচেতন মানুষ বুঝতে চায় সেই বাধার পরিমাণ, অতিক্রম করতে চায় তাকে, তার আত্মপরিচয় ক্রমে বিস্তারিত হয়ে দেখা দিতে থাকে তার দেশের পরিচয়ের মধ্যে, তার কালের পরিচয়ের মধ্যে।

সুতরাং ব্যক্তির লড়াই অহরহ চলে অহংরূপী বাধার সঙ্গে। আত্মাবগাহন ও আত্মমোচন চলে একই সঙ্গে। অমিত তার আসক্তিতে এবং নিরাসক্তিতে, তার অনুরাগে এবং বৈরাগ্যে এক যুগের বাঙালি মনীষার জীবন্ত বিগ্রহ। ত্রিশের দশকের গোড়ায় যখন অসহযোগ আন্দোলনের বিরতির ব্যাপারটা চরমপন্থীদের কাছে মনঃপুত হল না, তখন গোপাল হালদার নিজেও ছিলেন চরমপন্থীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁকে ব্রিটিশ সরকার বন্দী করেন। কারাগৃহেই তাঁর কল্পনাভূমিতে জন্ম নেয় অমিত। একটি দিনের পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের ভিতরে একজন সজাগ মানুষ কেমনভাবে তার মনের মধ্যে সময়ের সীমাকে ভেঙে ফেলে অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করে, তার অনুভূতি এবং বোধি, তার উপলব্ধি এবং চিন্তা একটা তরঙ্গিল নদীর উপমেয় হয়ে ওঠে — কেমন করে সবটা একটা চরিত্রে পরিণত হয় 'একদা' উপন্যাসে তা আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই প্রথম বাংলা উপন্যাস যা কোনও গল্প বলছে না — এই প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে অ্যারিস্টোটলীয় প্লট নির্মিতির নির্দেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হল। 'একদা' এ কারণেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে একটা ল্যান্ডমার্ক।

'একদা'-য় প্রত্যক্ষ দিনটা শীতের, 'অন্যদিন'-এ শরৎ, 'আর একদিন'-এ বসন্ত। যে জাতীয় আঙ্গিক রীতিতে 'ত্রিদিবা' লেখা, তাতে প্রত্যক্ষ দিনের সীমা ছাড়িয়ে স্মৃতিলোকের দিকে বারবার সন্নিহিত হওয়া, সেখান থেকেই ধীরে অভিজ্ঞতার মাত্রাকে নতুন করে তোলাটাই আসল কথা। তথাপি শীত, শরৎ, বসন্তের তিনটি দিন যেন ইঙ্গিতে আমাদের ধরিয়ে দিচ্ছে অমিতের জীবনেরই তিনটি পর্যায় — পুরাতনের অবসান, যাত্রার উদ্যোগ, যাত্রারম্ভ। শেষ খণ্ডে প্রিজন ভ্যানের মধ্যে সকল সহযাত্রীর পুনর্মিলন — নবীন প্রাণের বসন্তের বার্তাবহ পুরানো ঝরা পাতা পায়ে দলে পথিক বসন্ত, বাউল বসন্ত এগিয়ে চলে। রাষ্ট্র, সমাজ আর ব্যক্তির পরস্পর সন্নিপাতে এক চলিষ্ণু সত্তার জগৎ ও জীবনের চেতনা ক্রমশ একটা চরিত্র অর্জন করে। তার সেই হয়ে ওঠার এক নাম গোপাল হালদার — অপর নাম অমিত।

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক

পাঠক সমাবেশ

১৭/৩, আজিজ মার্কেট

শাহবাগ

ঢাকা

গল্প

# হস্তান্তর

গুণময় মান্না

এক

তখন সন্ধে হতে অল্প বাকি। কার্তিক মাসের শেষ, বাতাসে একটু হিমেল আমেজ। আকাশও বেশ পরিষ্কার।

এই জেলা শহরের উপকণ্ঠে একটি শিশু-উদ্যান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নানা রঙের পোষাক পরে মা-মাসিদের সঙ্গে উদ্যানে ঢুকছে বেরোচ্ছে, উৎসাহে আনন্দে বিচিত্র খেলায় মেতে উঠেছে, কেউ কেউ বা কেবল ছোটাছুটি করেই যাচ্ছে চেঁচামেচি করতে করতে।

অমরনাথ প্রধান উদ্যানের পাশ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন। শিশুদের এই অকারণ পুলক দেখে তাঁরও মনে তার ছোঁয়া লাগল, কিন্তু একটা চাপা নিঃশ্বাসও ফেললেন — এ জিনিস তাঁর হবার নয়। জায়গাটা থেকে সরে গেলেন তিনি। আবার পথ হাঁটতে লাগলেন। তাঁর ভয়, কেউ না কেউ এক্ষুনি তাঁকে চিনে ফেলবে। বিচিত্র রকমের কাজ-অকাজের কথা তুলে তাঁকে ফেলবে জড়িয়ে। সেটা এড়াবার জন্যই তো বাড়ি থেকে চলে এসেছেন কাউকে কিছু না বলে। অবশ্য একজনই জানে — তাঁর দলের বিশিষ্ট প্রবীণ কর্মী এবং তাঁর একান্ত সচিব প্রমথ সরকার। কিছুক্ষণের জন্য হলেও অমর একলা থাকতে চান, নিজের মনে।

একটু ছদ্মবেশের মতো করেছেন নিজেকে লুকানোর জন্যে। একটা সাধারণ চাদর গায়ে মাথায় জড়িয়েছেন, মুখের অনেকখানি ঢাকা। লাঠি কস্মিনকালে তিনি ব্যবহার করেন না, কিন্তু এখন সেই লাঠি ঠুকঠুক করে একটু ঝুঁকে পড়ে হাঁটছেন। তাঁর দেহ বেশ মজবুত, এটা অভিনয় করছেন মাত্র।

যাই হোক, শিশু উদ্যান ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলেন তিনি। এখন শহরটা ছাড়িয়েছেন, পিচের রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। একটু পরেই একটা বড় বাঁকের মাথায় এসে তিনি দাঁড়ালেন, এখানে একটা নদী আড়াআড়ি বয়ে গিয়েছে। জায়গাটা বেশ সুন্দর। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে রাস্তা ছেড়ে তিনি খানিকটা ঢালুর দিকে নেমে গেলেন। গায়ের চাদর খুলে ফেললেন, বসলেন ঘাসের উপর পশ্চিমমুখো হয়ে, হাতের লাঠিটা রাখলেন পাশে। না, এখানে পরিচিত কারুর আসার ভয় নেই।

অমর প্রধানের বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু ঠিক জরা বলতে যা বোঝায় তা তাঁকে এখনও স্পর্শ করেনি। দেহ টাল খায়নি। ফর্সা টকটকে রং, মাথার চুল একরাশ বলে কাঁচা-পাকাটাই বেশ মানানসই, ভরাট মুখখানি, বড়বড় চোখে করুণা মাখানো, প্রশস্ত ললাটে বুদ্ধির দীপ্তি। তাছাড়াও অনেক গুণপনা না থাকলে তিনি এতখানি সর্বজনবরেণ্য নেতা হতে পারতেন না।

অনেকেই নেতা হয়ে থাকেন। কেউ কেউ দু'এক বছর টিকেও থাকেন, কেউ বা রঙ্গমঞ্চে দু'দিনের জন্য উঠেই বিদায় নেন। অমরনাথ প্রধান সেরকম নন। তিনি তাঁর দলের সংগঠন-সদস্য ছিলেন সেই যৌবনকাল থেকে। আর গেল বিশ বৎসর ধরে সেই সংগঠনের শীর্ষেও আছেন, তাছাড়া তিনি গত তিনটে টার্মেই পরপর লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। সে যাই হোক, আর বছর খানেকের মধ্যেই এই তৃতীয় মেয়াদটা শেষ হবে — এখন থেকেই পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে তাঁদের কিছু না কিছু মাথা-ঘামাতে হচ্ছে। অবশ্য আরও নিকটে আছে একটা মিনি-নির্বাচন, এই শহরের পুর-সভার। এসব নিয়ে গেল দু'তিন দিন ধরে দলের বিভিন্ন স্তরে আলাপ-আলোচনা চলছে, সবার মতামত গ্রহণ করতে হচ্ছে। আজ সমস্ত দিন তো সেই কাজেই কেটেছে। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর বিরক্তি আর ক্লান্তির শেষ ছিল না। কেন এই বিরক্তি?

লোকসভার কথাই ধরা যাক। অমর বলেছিলেন — সেই দ্বিতীয় বারের পর থেকেই তিনি বলে আসছেন — এবার নতুন কাউকে দাঁড় করানো হোক, নতুন চিন্তাধারা নতুন উদ্যম আসুক। কিন্তু হলে কী হবে — দলের গণ্যমান্য লোকেরা খুব সিরিয়াসলি তাঁর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু এমনই চিন্তার দৈন্য যে ঘুরে-ফিরে সবাই তাঁর দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে, তিনিই থাকু ন। কেন, তিনি থাকবেন কেন ? তিনি কি চিরকাল বেঁচে থাকবেন ? এর উত্তরে তাদের কথার মর্মার্থ দাঁড়ায় — ওরে বাবা, তাহলে দল একেবারে রসাতলে যাবে। আহা, যত সব দুগ্ধ-পোষ্য শিশু, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। অথচ প্রত্যেকেই হাঁ করে আছে তাঁর পদটির দিকে, সুযোগ

পেলেই জাঁকিয়ে বসবে। এই দু'মুখো ভাবটা অমর একেবারে বরদাস্ত করতে পারেন না। আজ যখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তখন অন্তঃপুরে যাবার ছুতো করে, তারপর সেখান থেকে এইভাবে পালিয়ে এসেছেন।

পশ্চিম দিকে মুখ করে বসেছিলেন অমর। তাঁর আশে-পাশে নদীর কোলে গাছপালা বাতাসে নড়ে নড়ে উঠছে, কী একটা বুনো ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে। আরো নিচে নদীর শীর্ণ ধারা, স্রোত আছে কি নেই, এখানে ওখানে বক বসেই উড়ে চলে যাচ্ছে। — 'ওরা নিশ্চয়ই ওদের নীড়ে যাচ্ছে আর আমি অমনি করে আমার ঘরে যেতে পারব না ... উঃ কত রাত্রি পর্যন্ত যে ঝুলোকুলি ঠোকাঠুকি চালাতে হবে ...' কথাগুলো মনে মনে ভাবলেন তিনি।

নদীর কোল পেরিয়ে আরো দূরে তাকালেন অমর, ওপারের আকাশে। এই মাত্র সূর্য ডুবেছে, তার লাল আভা সমস্ত আকাশে বিছানো। তাকিয়ে দেখছেন অমর, লাল রঙটা বদলে যাচ্ছে, একটু ছায়া হয়ে এল, একটু পরেই আর লালের চিহ্নমাত্র থাকবে না। — 'আঃ, যদি ঠিক এমনিই হত ...' গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন অমর।

'মা, মা-গো...'

হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি, একটা চাপা অথচ মর্মভেদী গোঙানি শুনতে পেলেন। চকিতে তাকালেন এদিকে-ওদিকে, এমন কি পিছনে একটু উঁচুতে রাস্তার দিকেও — একজন দ্রুত সাইকেল চালিয়ে শহরের দিকে চলে গেল — কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। কী জানি, হয়ত বা ভুল শুনেছেন। যাক গে আবার তিনি পশ্চিমের রক্তিম আকাশের দিকে নিবিষ্ট হতে চাইলেন।

'উঃ ...'

এবার যেন অনেক কাছে, হয়ত আশেপাশেই কোথাও একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেন। যেন আন্দাজ করতে পারলেন কোন্ জায়গা থেকে আওয়াজটা আসছে। গড়ানে বাঁধের একটু নিচেই যে ছোট-ছোট গাছগাছালির ঝোপঝাপ সেখানেই কি কেউ আছে ? আড়ালের জন্য দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না ?

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন অমর, নিশ্চিত পায়ে আগাছার জঙ্গল কাটিয়ে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নিচে নেমে গেলেন — একটু গিয়েই দেখতে পেলেন তাকে।

একেবারে জলের ধারে এদিকে পিছন ফিরে এক যুবক বসে আছে — নিজের তোলা দুই হাঁটু দুই বাহুতে বেড় দিয়ে তার মধ্যে মুখ গুঁজে। ওরকম বসার ভঙ্গিতে অমর বুঝলেন, সে একটা সংকট-মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে, হয়ত চরম কিছু একটা করে বসবে।

হয়ত কৌতূহলে, হয়ত করুণায় তাড়াতাড়ি বাকি পথটুকু নেমে গেলেন অমর,যুবকটির পিঠে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'কে তুমি ... কী হয়েছে ?'

চমকে উঠে ফিরে তাকাল যুবকটি, সভয়ে বলল, 'কে আপনি ? কেন আমাকে ধরতে এসেছেন ? আপনার আমি কী করেছি ?'

তখনই জবাব দিলেন না অমরনাথ, দিতে পারলেন না। তিনি নিজে ঝুঁকে পড়েছিলেন, আর যুবকটির ঊর্ধ্বমুখ, উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টি — মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

কতই বা বয়স হবে — ছাব্বিশ-সাতাশের বেশি নয়। সুঠাম দেহ, এক মাথা চুল, টিকোলো নাক-মুখের গড়ন, বড় বড় টানা চোখ — ঠিক যেন অমরনাথের নিজেরই মতো। হেসে বললেন, 'ভয় পেওনা, তোমাকে ধরতে আসিনি আমি। তোমার নাম কী, কোথায় থাক... কিসের কষ্ট তোমার ?'

আর একটু তাকিয়ে থাকার পর মনে হল যুবকটি আশ্বস্ত হল — কথায় বলে পশুরাও স্নেহ-মমতা বোঝে, আর এ তো মানুষ ! আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমার নাম বিমল ... বিমল রায়। আমার কিসের কষ্ট ? সে আমি বলতে পারব না আপনাকে। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে ঘর ছেড়ে আমি এসেছি, আমার কর্মক্ষেত্র ছেড়েও, সেখানে আর ফিরে যাবনা...'

'তা নাই যাও, কিন্তু কোথায় তোমার বাড়ি ? কর্মক্ষেত্র বলছ, কী চাকরি করতে ?...'

'না স্যার, চাকরি নয়। ভাত-কাপড়ের জন্য আমাদের ফ্যামিলির কারো চাকরি করার দরকার নেই ...'

'তবে ? ...'

অমরনাথের এই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে বিমল যা জানাল তা হচ্ছে এই রকম : তার বাড়ি হচ্ছে পলাশচটিতে, এখান থেকে মাইল ষোল দূরে। সে এক বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে, এম-এ পাশ করেছে, বাবা-মা তার বিয়ে-থা দিতে চেয়েছিলেন, সে করেনি। তার অন্য কিছু করারও ছিল না, কিন্তু দেশের কাজ করা তার অনেক দিনের আকাঙ্খা, সেই কাজই সে করতে শুরু করেছিল, খুব উৎসাহ আর আন্তরিকতার সঙ্গেই। সামনেই ছিল গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাতে সে দাঁড়াতেও পেরেছিল। কিন্তু হঠাৎ তার নামে ওরা একটা দারুণ অপবাদ দেয়। সেই অপবাদের পর গ্রামে থাকা একেবারেই অসম্ভব — তাই সে চিরদিনের মতো গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। এ মুখ আর কাউকে সে দেখাবে না। বলতে বলতে বিমলের কী রকম ভাবান্তর উপস্থিত হল, সে ঝুঁকে পড়ে অমরনাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, বলল, 'স্যার



আপনি বিশ্বাস করুন, ওরা যে অপবাদ দিয়েছে, তা মিথ্যে, আমি কোনও অন্যায় করিনি ...'

'সম্ভব ... তোমার মুখ দেখে তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়। তাছাড়া, অন্যায় ... ন্যায়-অন্যায় সঠিক-বেঠিক কি এত সহজেই স্থির করা যায় ...'

কৃতজ্ঞতায় বিমল আর একবার ঝুঁকে পড়ে পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছিল, অমরনাথ তাকে ধরে ফেললেন, 'কাউকে অত প্রণাম করতে হয় না... তাছাড়া, তুমি আমাকে চেন ?'

'না, কিন্তু স্যার, আপনাকে দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। বিশ্বাস করুন, আমার কথা আমি কাউকে বলতে পারিনি, বাবা-মা'কেও নয়। কিন্তু আপনাকে আমি সব বলেছি, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব...'

'মানে, একটু বলনি আর কি। তা নাই বললে... আচ্ছা, তুমি জলের ধারে অমনি করে বসেছিলে কেন, নদীতে স্রোত নেই, তাছাড়া জল অগভীর। জানতো, আত্মহত্যা মহাপাপ...'

'কই, না তো, আমি আত্মহত্যা করতে চাইনি...'

অমরনাথ অপ্রতিভ হলেন। কথা ঘুরিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি পঞ্চায়েতিতে নেমেছিলে কেন ? আর কিছু করার ছিলনা বলে ?'

বিমল এ প্রশ্নের খুব চটপট উত্তর দিল, 'এটা দিয়েই আমি শুরু করেছিলাম। কিন্তু ওটা তো আমার লক্ষ্য নয়। আমি বড় হতে চাই, অনেক উঁচুতে উঠতে চাই...'

বাঃ, আবারও মুগ্ধ হলেন অমরনাথ, এই ছেলেটিই যেন সেই কতদিন আগেকার তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি। ওই যে গানে শুনেছেন — পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি, এই ছেলেটি যেন তাঁর সেই পূর্বাচল। একদা তিনিও এই ছেলেটির মতো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাজে নেমেছিলেন, তাঁরও মনে ছিল অনেক উঁচুতে উঠবেন, ছিল উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাস। কিন্তু এই ছেলেটি কিনা প্রথম পা ফেলতে গিয়েই ঘা খেয়েছে, আহা রে। এখন দরকার ওকে নতুন প্রাণে উজ্জীবিত করার। সস্নেহে বললেন, 'তুমি ঘর ছেড়ে এসেছ, ভালই হয়েছে। বড় কাজ করতে হলে শিকড় উপড়েই আসতে হয়। কিন্তু জান তো, বড় হতে হলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি উঠতে হয়, নিজের পথ নিজেই করে নিতে হয়। কেউ সাহায্য করে না, বরঞ্চ বাধা দেয়। এর জন্য দরকার ধৈর্য সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় অমানবিক পরিশ্রম, আর সর্বোপরি উৎসাহ এবং আন্তরিকতা ... পারবে ? '

'পারব ... আমাকে বিশ্বাস করে কাজ দেবেন ?'

'দেব ... তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি একটা নাম ঠিকানা দিচ্ছি ... প্রমথ সরকার, নতুনচটিতে তার বাড়ি। বলবে যে আমি পাঠিয়েছি, তাহলে সে তোমাকে তার বাড়িতে নিজের হেপাজতে রাখবে, তোমাকে কাজও দেবে, এস...' বলে বিমলের হাত ধরে তাকে নিয়ে বাঁধের ওপর রাস্তায় এলেন, এবং শহরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর খেয়াল হল না, একটু আগেকার তাঁর বসার জায়গায় যে লাঠিটা রেখেছিলেন, সেটা ফেলে এলেন।

বলছিলেন, 'জনসেবামূলক কাজ করতে বলে, আর তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে বড় করে তুলতে হলে, তোমার প্রথম কাজ হবে জনসংযোগ ... মানুষকে চেনা এবং তাদের সঙ্গে নিজের আইডেন্টিটি ভুলে মিশে যাওয়া। হ্যাঁ, এটাই তুমি শুরু কর...'

বিমল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, আমি তাই করব, গোড়া থেকেই শুরু করব। আপনি আইডেন্টিটি ভুলতে বলছিলেন ... স্যার, একটা কথা আমার মনে আসছে। এখানে যদি আমি কাজ করি, তাহলে আমার বাবা-মা, কি গ্রামের লোক আমাকে চিনে ফেলবে, প্রমথ বাবুরাও দু'দিনে চিনে যাবেন। তাই আমি ভাবছি, আমার নাম বলব বিমল ভট্টাচার্য, রায় নয়... এসেছি কলকাতা থেকে আপনার কাজ করার জন্য ... তাই করব ?'

অমরনাথ চমৎকৃত হলেন, মুখ ফিরিয়ে তাকালেন ওর দিকে। আইডেন্টিটি ভোলা — অমরনাথ একভাবে বলেছিলেন, আর বিমল সেটার এই ব্যাখ্যা করে বসল ! তবে কিনা, ওরকমও তো হয়, নিজের নাম পাল্টানো নিজেকে ভোলার বিরোধী নয়। তাহলে এর প্রস্তাবটাই বা ঠেলবেন কী করে ? — আর ছেলেটির মুখখানা, তাঁরই মতো টানা চোখ — ন্যায়-অন্যায় জানিনে, শুধু তোমারে জানি। বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না সেটা ঠিক হবে কিনা। আচ্ছা, তাই কর ...'

বলে হাত ছেড়ে অমরনাথ বিমলের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

## দুই

আমি বিমল ছেলেটিকে দেখে খুবই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম — নিজের এই মনোভাবটা খতিয়ে দেখছিলেন অমরনাথ। প্রমথ সরকারের হেপাজতে তাকে পাঠিয়ে দু'একদিন চুপ করে রইলেন, কিছুই করলেন না। সহসা বিদঘীত ন ক্রিয়াম্ — এটা তো প্রথম দিন তাঁর মনে ছিল না।

এখন একটু খটকা লাগছে কি ? ভাবলেন, পলাশচটিতে পঞ্চায়েতি ব্যাপারে বিমল কী অপরাধ করেছিল — যা সে নিজে বলতে চাইল না, তার থেকেও আশ্চর্য তিনি নিজেও সেটা জানবার জন্য চাপ দিলেন না ! সে নিজেই লজ্জায় ছিটকে এসেছে, না কি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ? অনুসন্ধান করে কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জেনে তবেই তো তাকে কাজে

লাগাতে হয় — সংগঠনী কার্যক্রমে এই নীতিই তো এতদিন অনুসরণ করে এসেছেন তিনি। কিন্তু তাতেই বা কী ফললাভ হয়েছে — এখন সমস্ত দলটাই মিথ্যাচার এবং চাটুবাদের আস্তানায় পরিণত হয়েছে! সকলেই দেখায় আদর্শ এবং নেতার প্রতি তাদের একশো ভাগ আনুগত্য, কিন্তু তলেতলে সুযোগ-সন্ধানী, দাঁও মারতে উৎসুক।

সুতরাং কারোর দোষত্রুটির আণুবীক্ষণিক খোঁজখবর করে লাভ কী? তার থেকে ওই কথাটাই ভাল — পুণ্যেপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে বিমর্ল মানুষ হয়ে উঠুক। অনর্থক দোষ ধরতে থাকলে মানুষটাই দোষী হয়ে যায়।

হল — কিন্তু আরও একটা কথা আছে। অমরনাথ বিমলকে উপদেশ দিয়েছিলেন আত্মশূন্যভাবে জনসংযোগ করতে। বিমল তার জন্য কী করেছে! বুঝেছে, তার রায় পদবী বদলে তখন থেকেই ভট্টাচার্য হবে। এটা কি অহংশূন্যতা? — এ তো একটা কামুফ্লাজ। তবে কিনা, তিনি নিজে কি কখনও কামুফ্লাজ করেননি? সেদিন যে বুড়োর ভান করেছিলেন লাঠি ঠুকঠুক করে।

অমরনাথের মনে খটকা কাটতে চায় না।

দিন দশেক পরেকার কথা। দিনের কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে যায় — তখন দশটা পেরিয়ে গেছে। অমরনাথ এখন বৈঠকখানা থেকে অন্তঃপুরে যাবেন। শেষমেশ তাঁর একান্ত সচিব প্রমথ সরকার কিছু ফাইলপত্র বগলে পুরে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। অমরনাথ তাঁকে ডেকে বললেন, 'ওহে, শোনো, তোমার কাছে বিমল বলে যে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিলাম সে কেমন কাজকর্ম করছে?...'

প্রমথ দরজা থেকে ফিরে এল, 'দারুণ, স্যার...', তার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'কী রকম দারুণ, একটু বল... কী কাজে লাগিয়েছ ওকে?'

'আর মাসখানেক পরেই তো পুরসভার নির্বাচন। বিমলকে সেই কাজে লাগিয়েছি। এই শহরে সাঁইত্রিশটা ওয়ার্ড, ইতিমধ্যেই সে অন্তত একুশটা ওয়ার্ডে মিটিং করেছে, সতেরোটা মিছিল সংগঠিত করেছে। স্যার, গেল নির্বাচনে আমাদের দল চল্লিশ পার্সেন্ট সীট পেয়েছিল, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এবারে আশি ভাগ পেরিয়ে যাবে...'

'কী জন্যে একথা বলছ?...'

'বলছি এই জন্যে, সমস্ত শহর তামাম ভোটাররা উত্তেজনায় টানবণ করছে, রাগে থরথর করে কাঁপছে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত আমাদের দলের স্লোগান আওড়াচ্ছে, দুর্নীতি চলবে না। আমাদের দাবি মানতে হবে...'

'বল কি, এই কদিনেই এইরকম পরিবর্তন হল!...'

'হবে না? বিমল ... এ শুধু বিমলের জন্য। ও যেখানেই যায় ওকে দেখে এর বক্তৃতা শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যায়। আর ছেলেটি দেখতেও সেই রকম, ঠিক নেতাজির মতো...'

'কথাটা কি যোগরূঢ়?...' মুখ টিপে হাসলেন অমরনাথ।

'মানে...'

'মানে, নেতাজি ... বিমল কি সুভাষচন্দ্রের মতো, না কি তুমি লীডার মনে করছ?...'

'না স্যার, সুভাষচন্দ্রের মতো, একবার জনতার সামনে দাঁড়ালেই...'

'আচ্ছা, তুমি যাও...'

রাত্রির আহারাদি শেষ করে অমরনাথ কথাগুলো না ভেবে পারলেন না। বিমল তাহলে এইভাবে জনসংযোগ করছে? তাঁর নির্দেশের মানে তাহলে তার কাছে এই দাঁড়িয়েছে? জনসংযোগ মানে জনতাকে উত্তেজিত করা, মুগ্ধ করা — গরম বক্তৃতা আর মিছিলের মধ্যে?

একটা ভারি নিঃশ্বাস পড়ল অমরনাথের। মনে পড়ল তাঁর নিজের ওই বয়সের কথা। জনসংযোগ বলতে তিনিও ওই কথাই বুঝেছিলেন এবং ঠিক বিমলের মতো বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়েছেন, আর মানুষকে দাবি করতে শিখিয়েছেন — হেন চাই তেন চাই। এ কি অবিকল তাঁকেই নকল করে চলেছে? অথচ, অমরনাথ চেয়েছিলেন, ছেলেটি একটু অন্যরকম ভাবুক, অন্যরকম কাজ করুক। জনসংযোগ কেবল তো ভোট নয়।

'কেবল ভোট নয়। কিন্তু ভোটও তো জনসংযোগের অন্যতম মাধ্যম —' উল্টো কথাটাও মনে হল অমরনাথের। তবে? নাঃ অনেক রাত্রি হয়েছে — মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুলেন তিনি।

আরও কয়েক দিন পরে বিমলকে ডেকে পাঠালেন অমর। এবং বিমল তো তাঁর কাছে আসতে পেরে দারুণ খুশি। দেখলেন, এরই মধ্যে তার যাকে বলে বেশ গায়েগতি লেগেছে — তার মুখখানা এমনিতেই মনোহর, তার ওপর রক্তাভ লেগেছে — চোখের চাউনিতে সে নিষ্প্রাণতা নেই, কালো চোখের দৃষ্টি ঝকঝক করছে। সে বলল, 'কতবার যে আপনার কাছে আমি ছুটে আসতে চেয়েছি, কিন্তু আসিনি, নিজেকে সংযত করেছি। তার কারণ আমি আপনার মন বুঝি, আপনি আমাকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাতে আমি ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি। তাই ভেবেছিলাম, আমি কাজ করে তবে আপনার কাছে আসব। স্যার, আমার কাজ আপনার পছন্দ হয়েছে? প্রমথদা সবই তো আপনাকে রিপোর্ট করেছেন...'



চমকে উঠলেন অমরনাথ — এ ছোকরা কি তাঁর মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পায়? বিমল সম্বন্ধে তিনি ঠিক ওই কথাই ভেবেছিলেন কিনা, তা ভেবে উঠতে পারলেন না — কিন্তু ওই রকম তাঁর পক্ষে ভাবা অসম্ভব ছিল না। যে কোনও ভাবনার বৈধতা তো কর্মের মধ্যে — আর কর্ম তো কখনও ভাবনার অবিকল প্রতিলিপি হয় না। তাছাড়া, তত্ত্ব-ভাবনা বিদেহী, কর্মে আকার পেলে তবেই তো তাকে চেনা যায়। হয়ত এই রকমই তিনি ভেবেছিলেন। অগত্যা বিমলকে একা প্লাস পয়েন্ট না দিয়েও তিনি পারলেন না।

বললেন, 'দেখ, কোন্ কাজের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে, তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ধরা গেল, তোমার ভোটের পথেই তা হবে। কিন্তু সে কাজটাও তো সত্য হওয়া চাই, নিখুঁত হওয়া চাই। কাজের একটি স্থূল দিক আছে, সেটা সবাই দেখতে পায়, কিন্তু খুব খুঁটিনাটিতে হাতলাগানো, সেটা সবার পক্ষে হয় না...'

বিমল তৎক্ষণাৎ বলল, 'হাঁ স্যার, ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছি। খুঁটিনাটি ... দেখতে গেলে সেরকম অনেক আছে। আমি যেসব জিনিস ভেবেছি, তার মধ্যে দুটো আপনার সামনে উপস্থিত করছি। তবে কোন্‌টা করব, কোন্‌টা আপাতত করব না, আপনি আমাকে নির্দেশ দিতে চান না জানি, কিন্তু সেটা আপনার অনুমোদন-সাপেক্ষ...'

'কী বলতে চাও শুনি...'

'পুরসভার নির্বাচন, খুব শিগগির সেটা হবে। প্রস্তুতও হচ্ছি অনেকখানি হয়েছে। কিন্তু এর আরও দুটো দিক আছে, গোড়া এবং আগা...'

'গোড়া বলতে?...'

'ভোটার লিস্ট। বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে আমার এই ধারণা হয়েছে, অনেক লোকই বলেছে তালিকায় তাদের নাম নেই, তার সংশোধন করা দরকার। আর আগা বলতে আমি ভোটের দিন নির্বাচন-কর্মী রেডি রাখার কথা ভাবি। প্রত্যেক বুথের জন্য এক গোছা করে বেশ দক্ষ লোক মোতায়েন করা দরকার, যার নির্বাচনের গতিপথ সুষ্ঠু করবে, বিপথে চলে যেতে চাইলে তাকে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করবে...'

অমরনাথের চোখ বিস্ফারিত, তিনি ঢোক গিলে একটু হাসলেনও। বললেন, 'তুমি কি রিগিং বা বুথ-ক্যাপচারিং এর কথা ভাবছ?...'

'না...'

'তবে? তোমার এসব কথার মানে কী?...'

'স্যার ঠিক আপনার কাছেই ইন সো মেনি ওঅর্ডস কথাগুলো শুনেছি তা নয়। কিন্তু সেই প্রথম দিন আপনি আমাকে বলেছিলেন, ন্যায়-অন্যায় সঠিক-বেঠিক কি এত সহজেই নির্ণয় করা যায়? সে কথাটা আমি মনে রেখেছি ... আমি রিগিং, কি, বুথ-ক্যাপচারিং কেন এসবের ওপর মন্দ লেবেল এঁটে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকব? লক্ষ্যই বলে দেয় কোন্ পথ ঠিক কোন্‌টা নয়...'

মাথা নাড়লেন অমরনাথ, কিছুক্ষণ চুপ করেও রইলেন — স্পষ্টত ভাবছিলেন তিনি। বললেন, 'শোন, বিমল, সেই প্রথম দিন তোমাকে দেখে আমার ভাল লেগেছিল, তোমার মধ্যে আমি একটা ফায়ার দেখেছিলাম ... মনে হয়েছিল তুমি পারবে। আরও একটা কথা। আজীবন আমি সহকর্মীদের ট্রেনিং দিয়েছি, নির্দেশ দিয়ে দিয়ে পরিচালনা করেছি ... কিন্তু কেন জানি না, প্রথম দিনেই ভেবেছিলাম, একটা ছেলেকেও অন্তত নির্দেশ না দিয়ে আমি ছেড়ে দেব, টু সী হোআট গুড্‌স হি ডেলিভারস্। আজও তোমার সম্বন্ধে আমার সেই মনই আছে, আশা করি ভবিষ্যতেও থাকবে ...'

বিমল তাড়াতাড়ি নুয়ে পড়ে অমরনাথের পায়ের ধুলো নিল, উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল তাঁর মুখের দিকে — এতই অভিভূত যে কথা বলতে পারল না — তার চোখে সাশ্রু কৃতজ্ঞতা।

অমরনাথ বললেন, 'কিন্তু দেখ, তোমাকে আমি খুব বড় দেখতে চাই। এখন পুর-নির্বাচন, তারপর লোকসভার নির্বাচন ... তোমাকে সমস্ত হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু এই মনে রেখে যে ওসব তোমার লক্ষ্য নয়, তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, তোমাকে পেরিয়ে যেতে হবে ...'

'আমি পারব, স্যার, আমাকে আশীর্বাদ করুন ...' বলে বিমল মাথা নত করল, আর অমরনাথ তার ঘন চুলের ওপর সস্নেহে ডান হাতখানা রাখলেন।

## তিন

দিনের পর দিন কাটে, পুর-নির্বাচন এগিয়ে আসে, সেটার পিছনে লোকসভার নির্বাচন উঁকি মারতে থাকে। অমরনাথ অনুভব করছিলেন, তিনি ঠিক আগেকার মতো আর নেই। আগে যেমন নিশ্চিত কড়া হাতে সর্ব কর্মের হাল ধরতেন এখন সেটা পারছেন না — তাঁর এমনও মনে হয়, সেদিকে তাঁর মনও নেই। একটা দল তিনি গড়ে তুলেছিলেন, নিখুঁত না হোক সেটা সক্রিয় বটে — যন্ত্র যেমন তেমনই সেটা কাজ করে যাবে। অর্থাৎ তাঁর সাত্বনা, তাঁর সহকর্মীরা ঠিক কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যদিকে বিমলকে নিয়েও তিনি ধাঁধায় পড়েছেন। তিনি অবাক হয়ে যাচ্ছেন নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে। ছেলেটা সর্বদাই যেন তাঁর আঁতের কথা আঁচ করতে পারে, আর সেটা টেনে বের করতে থাকে। ফলে বিমল যা কিছু করে, কোন না কোনও ভাবে সেটা যেন তাঁরই কাজ হয়ে যায়। নিজেকেই নতুন

করে আবিষ্কার করছেন ছেলেটার মধ্যে।

'বিমলকে কি আমি নির্দেশ দিচ্ছি, নাকি, সে-ই আমাকে নির্দেশ দিয়ে চলেছে ?...' অমরনাথ সেটা যাচাই করার জন্য ওকে ডেকে পাঠান, কিছু কথা বলার জন্য, কিন্তু প্রতিবার সেই একই জিনিস হয়, ছেলেটা তাঁর কথাগুলো টেনে নিয়ে বলতে যাবে।

পুরসভার নির্বাচন হয়ে গেলে দেখা গেল, অমরনাথের দলই বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করেছে। কিন্তু এও দেখা গেল স্থানীয় পত্রপত্রিকা এবং কলকাতার কাগজেও এই দলের নামে পেশী-শক্তি, কারচুপি এবং বুথ-দখলের অভিযোগ করেছে। তাছাড়াও বলেছে, ভোটার লিস্টে দলের তাঁবেদার এবং ভূতুড়ে নাম ঢোকানো হয়েছিল। যখন এসব নিয়ে সর্বত্র বেশ মুখরতা, তখন সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করার জন্য প্রথমে তিনি প্রমথের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন — উদ্দেশ্য যে তারপর কার্যনির্বাহী সমিতিতে ব্যাপারটি উপস্থিত করবেন। প্রমথকে খবর দিলেন, বললেন বিমলকেও সঙ্গে নিয়ে আসতে।

সেটা পুরসভা নির্বাচনের দিন সাতেক পরেকার কথা। সেদিনও রাত্রি দশটা পেরিয়ে গেছে নিভৃতে কোনও কথা আলোচনা করতে গেলে রাত্রি ছাড়া উপায় থাকে না, এতই ভিড় — প্রমথ এসে উপস্থিত হল। অমরনাথ অবাক হলেন, 'কী ব্যাপার, একলা এলে যে; বিমল কোথায় ? ...'

বিমলের উল্লেখ করতেই প্রমথর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'স্যার, বিমল আসতে পারল না ...'

শোনা মাত্র অমরনাথের ভুরু কুঁচকে উঠল। তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন, অথচ বিমল আসতে পারল না ! প্রমথ সেটা বুঝে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করল, 'না, স্যার, তার কোন দোষ নেই আমার কাছে আপনার চিঠি গেল আজ সকালে, কিন্তু সে গতকাল সকাল থেকেই বেরিয়ে গেছে, ঘুরছে মফঃস্বলে। ফেরেনি এখনও, একটু আগে পর্যন্তও তার জন্য অপেক্ষা করে তবে আমি এসেছি...'

'মফঃস্বলে ঘুরছে ! কেন ?..'

এ প্রশ্ন শুনে প্রমথ একটু বিস্মিত হল, 'কেন ... আপনি বলছেন ? সে কি আপনার নির্দেশেই এই লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী এলাকায় ঘুরে বেড়ানো শুরু করেনি ?...'

'আমার নির্দেশে ? কই, আমি তো তাকে কোথাও যেতে বলিনি...'

'আশ্চর্য , এটা তাহলে তার নিজেরই ইনিশিয়েটিভ ! ঠিক পুরসভার ক্ষেত্রে যা সে করেছিল। তাকে একগুণ করতে বললে দশগুণ করে...'

'কিছু না বললেও করে দেখা যাচ্ছে। প্রমথ, ব্যাপারটা কী বল তো...'

'স্যার, আমি যতটা জানি আপনাকে বলছি। বিমল একটা অদ্ভুত ছেলে, তাকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমরা যখন পুরসভা নিয়ে ব্যস্ত ... ও নিজেও ব্যস্ত ছিল, আমরা যদি আটআনা তো সে ষোলো আনা ... তখনই সে শত কাজের মধ্যেও পরের লোকসভা নির্বাচন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, এমনি তার দূরদৃষ্টি...'

অমরনাথের মনে পড়ল, ঠিক এইভাবে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একটুও ভাল লাগল না, বিমল অন্যের ভালবাসাও কেড়ে নেবে, এটা তো তাঁরই দেবার কথা। বরঞ্চ প্রমথদের কাছ থেকে ওর সম্বন্ধে ঈর্ষা দেখলে হয়ত তাঁর ভাল লাগত। তিনি শুকনো স্বরে বললেন, 'সমস্ত কাজই তো প্রকৃতপক্ষে ফিউচারিস্টিক ভবিষ্যৎমুখিন ...'

'আঁ ?...' একটু থতমত খেয়ে গেল প্রমথ, তারপর হাত কচলে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার ...' তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল।

অমরনাথের মাথায় চকিতে কথাটা এল — বিমল প্রমথদের কতটা প্রিয় হয়ে উঠেছে ? অন্য কথায়, দলের কর্মীদের কতটা কব্জা করতে পেরেছে ? কিন্তু একথা তো তাঁর জায়গায় বসে জিজ্ঞেস করা যায় না। তাই তিনি কথা ঘোরাতে লাগলেন। হেসে বললেন, 'ব্যাপার কী বল তো, প্রমথ, তোমরা এর সম্বন্ধে কী বুঝছ ? পরের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে ও-ই মনোনয়ন পেতে চায় নাকি ? ...'

প্রমথ জিভ কাটল এবং সবেগে মাথা নাড়ল, 'স্যার, একটুও না। ও খুব সাচ্চা ছেলে, এই ক'দিনের অভিজ্ঞতায় আমি যদি কিছু বুঝে থাকি, তাহলে আমি জোর দিয়ে তা-ই বলব, ও নিজের জন্য কিছু চায় না...'

'বলে যাও...'

'কী বলব...' স্পষ্টত প্রমথ বিভ্রান্ত হচ্ছিল, বুঝতে পারছিল না, তাদের বস ঠিক কোন দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। সে হাতড়াতে লাগল, 'ও বাইরে বেরিয়ে গেছে দলের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তার একটাই লক্ষ্য। সে বলে, আগ সংগঠনকে তৈরি করতে হবে, একট ঘোড়াকে দলাইমলাই করে দৌড়িয়ে-ছুটিয়ে যেমন করে গেটসেট করতে হয় ...'

অমরনাথের বুঝতে অসুবিধা হল না, ভাষাগুলো প্রমথর বানানো নয়, বিমলেরই। এটাতে খুশি হলেন তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথাটাও মনে হল তাঁর — বিমল তাঁর সংগঠনকে গেট-সেট-রেডি করে কোন্ লক্ষ্যে গো বলবে ?

'স্যার...'

'হ্যাঁ, বল...'



'আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন না, বিমল নিজে দাঁড়াতে চায় কিনা। এ কথাটা আমারও মনে হয়েছিল। পরীক্ষা করবার জন্য আমি তাকে বলেওছিলাম। এ কথাটায় অমরনাথ বুঝলেন — প্রমথ নিজের সাফাই গেয়ে রাখছে। শুনে সে কানে আঙুল দিল। বলল, তাকে এখনও অনেক দূর। হাঁটতে হবে, তবে সে তার যোগ্য হবে...'

'বর্তমানে কোনও যোগ্য ব্যক্তির কথা বলে সে ?...'

প্রমথর বিভ্রান্তি কেটে গিয়ে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। — 'বলে, স্যার আপনার কথা। আমাদের সবার মনের কথাই সে বলে। বলে, আমরা সবাই এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আছি ... অমরদা দীর্ঘকাল ধরে এম-পি আছেন, জনসংযোগ থেকে শুরু করে পার্লামেন্টারিয়ানিজ্‌ম পর্যন্ত সমস্ত ছিুর কোন দিকেই তাঁর কড়ে আঙুলের যোগ্য কেউ নেই। কিন্তু...' বলে মাথা চুলকোতে লাগল প্রমথ।

'কিন্তু কী ?...'

'বলে, অমরদার মনোনয়ন এবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হতে হবে। এজন্য কন্‌টেস্ট দরকার ... ফল এবং লক্ষ্য পূর্বনির্দিষ্ট, অমরদাই হবেন, কিন্তু ভোটে দাঁড়াতে হবে আরো পাঁচ-সাত জন কর্মীকে। সে আমাকেও দাঁড়াতে বলে, যেমন বলে নওগাঁর বিপিন বাঁড়ুজ্যে, কি বেলতলার আখতার হোসেনকেও...'

অমরনাথের মাথা টিপটিপ করতে লাগল। কিন্তু যেন পরিহাস করছেন এমনিভাবে বললেন, 'কথা তো সে ঠিকই বলে। কিন্তু এসবের সঙ্গে আরও একটা কথা তার বলা উচিত, সিক্রেট ব্যালট...'

শোনা মাত্র প্রমথর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল, অভব্যতা হবে জেনেও হাততালি দিয়ে ফেলল, 'স্যার, আপনি অন্তর্যামী। আপনি কী করে যে মানুষের মনের কথা বোঝেন ... সে তো ওই কথাই বলে। কিন্তু এটা কি আপনি বারণ করবেন না ? আমাদের দলে কখনও এরকম হয়নি ...'

'কখনও হয়নি বলে কখনও হবে না এরকম বলা যায় কি? তাছাড়া, সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে, সিক্রেট ব্যালট নিশ্চয়ই ভাল সিক্রেট ব্যালট নিশ্চয়ই মন্দ ... কোন্ দিকে জিনিসটা ব্যবহার করা হয় তার ওপর ফলাফলটা নির্ভর করে...'

'স্যার !...'

একটু চুপ করে রইলেন অমরনাথ। কলিং বেল টিপলেন, সেটা বাজল তাঁর অন্তঃপুরে। পরিচারক এসে দাঁড়াতে বললেন, 'দুকাপ চা নিয়ে আয় ...'। এসব করার এমনিতে তাঁর দরকার ছিল না, কিন্তু তাঁর দরকার ছিল চিন্তা করবার একটু সময়, একটু আড়ালের। ভেবে নিলেন যে এ আলোচনাটা আর নয়।

বললেন, 'শোন প্রমথ, তোমাকে আমি অন্য কারণে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। আমাদের কাজ হবে ভবিষ্যৎমুখিন, কিন্তু অতীতের পর্যালোচনা ছাড়া আমরা এগোতে পারি কি ? পুরসভার নির্বাচনে আমাদের সম্বন্ধে নিন্দা রটনা করা হয়েছে, রিগিং আর বুথ-ক্যাপচারিং নিয়ে ... কার্যনির্বাহীতে এ নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া উচিত নয় কি ?'

'স্যার, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চয় করে আমার মনের কথা বলতে পারব, এতক্ষণ বিমলের ব্যাপার আপনাকে আমি বোঝাতে পারছিলাম না। আপনি যদি মিটিং ডাকেন, এ্যাজেন্ডা দেন, তাহলে নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যা চুকে বুকে গেছে, তাতে খুঁচিয়ে ব্রণ তোলার দরকার কী ? তাছাড়া...'

'তাছাড়া কী ? নির্ভয়ে বল, আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই...'

'স্যার, আপনার কাছে কোনও কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা। কিন্তু আপনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। কোনও কাজ ভাল কি মন্দ, সেটা তার ফল দেখেই বিচার করা উচিত। আমরা পুরসভার মেজরিটি ছিলাম না, এখন হয়েছি। আমাদের মেজরিটি যদি ভাল হয়, যদি তাতে জনগণের কিছু ভাল হয়, তাহলে রিগিং এর ওপর আমরা সর্বদা একটাই লেবেল এঁটে দিই কেন, মন্দ মন্দ। যেটা মানুষ চাইছে, অনেক মানুষ চাইছে, অথচ একটা সংখ্যার জন্য একেবারে প্রান্তে এসে ঠেকে গেছে, সেখানে একটু ধাক্কা দিয়ে সেই চাওয়াটাকে প্রকাশ করে দেওয়াই ঠিক নয় কি ? সেই একটুখানি ধাক্কাটাই রিগিং। স্যার, রিগিং এবং র‍্যাগিং দুটোই তো পার্সোনালিটি টেস্ট, একটু ঘা দিয়ে উস্কে দেওয়া ...'

'ঠিক আছে, প্রমথ, কার্যনির্বাহীতে আমি বিষয়টা দিচ্ছি।। এখন তুমি এস ...'

অমরনাথের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, এতক্ষণ বিমলের টেপ-করা কথা শুনছিলেন।

## চার

কিছু বিমলকে তিনি ছেড়ে দেননি। তার যে দৌড়টা তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন, সেটার পুরো আবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন। সব জিনিসেরই দুটো দিক আছে — সত্যিই দু'ভাবে নেওয়া যায় — আত্মলোপ নাম-পরিবর্তনেও হতে পারে। সংগঠনে নতুন রক্ত আমদানি পুরনো লোককে দিয়েও হয়, যেমন হয় নতুন লোককে দিয়েও। হতে পারে নতুন লোককে দিয়ে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাও। বিমলকে, তথা নিজেকে কোন্ ক্যাটিগরিতে ফেলবেন তিনি ? অপেক্ষা করতে হবে, দেখতে হবে।

দিনের পর দিন অপেক্ষা করলেন অমরনাথ, ঘটনাবলী লক্ষ করে গেলেন। লোকসভার নির্বাচনও দেখতে দেখতে এসে গেল। এই কেন্দ্র থেকে নাম যাবে রাজ্য দপ্তরে, কলকাতায় ; সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সংগঠনে, দিল্লীতে। এখানে সংগঠনের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন হল, গোপন ব্যালটের মাধ্যমে — বিমল এতদিন ধরে যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে আসছিল।

অমরনাথ এ ব্যাপারে প্রতি স্তরে বিমলের সহযোগিতা করলেন। এমনকি নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারও হতে রাজি হলেন — যদিও প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ছিল, বিপিন বাঁড়ুজ্যে আখতার হোসেন প্রমুখ সরকার প্রমুখের সঙ্গে। একরূপ হয় না, ওটা বিমলের বিশেষ ব্যবস্থাপনা অনুসারে হল। কারুর আপত্তি করার কথা নয়, কেউ করলও না।

বিমলের সঙ্গে প্রার্থিত্ব নিয়ে অন্তরঙ্গ কথা হয়েছিল অমরনাথের।

'দেখ, আমি তিনটে টার্ম এম-পি আছি, এবার আমি আর যেতে চাই না। তুমি আসার অনেক আগে থেকেই আমি এটা বলে আসছি। নতুন মুখ আসুক...'

'সেটা দলের কর্মীরাই ঠিক করুক, তারা কাকে চায় ...'

'দলকে যদি আমি একটুও বুঝতে পেরে থাকি, তাহলে বলব তারা তোমাকেই চায়। বিমল, আমিও তোমাকে চাই, সেই প্রথম দিন থেকেই...'

বিমল অমরনাথের পায়ে হাত ছুঁইয়ে বলল, 'অমরদা, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমাকে আশীর্বাদ করুন। এক দিন হয়তো আমি আপনার মান্য রাখতে পারব, কিন্তু এখন নয়। আমি দাঁড়াচ্ছি না, অমরদা আপনি প্রসন্ন মনে এটা মেনে নিন...'

'আমিও তাহলে না দাঁড়ালাম...'

বিমলের উত্তর যেন তৈরিই ছিল, 'অমরদা, আপনি এখানে নির্বাচনের পরও সরে দাঁড়াতে পারবেন, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর অনুকূলে...'

'আর যদি আমি প্রথম না হই...'

'ডেমক্রাসিতে তো সেজন্য কারুর খেদ করার কথা নয়...'

'রাইট... কিন্তু ধর, যদি সেই প্রথমের পিছনে তোমার মুখ উঁকি মারে ... এক রঙের স্বচ্ছ পর্দার পেছনে আর-এক রঙের পর্দার মতো ?'

'স্যার, এইবার আমি রাগ করব... আমার জন্যে নয়, আপনার ওপর। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, সর্বজনবরেণ্য বর্ষীয়ান নেতা অমরনাথ প্রধান প্রথম হলে সেক্ষেত্রেও এই তুচ্ছ বিমল ভট্টাচার্য তাঁর পিছনে থাকবে...'

'রাইট, ইউ আর অলওয়েজ রাইট, থ্যাঙ্ক ইউ...' বলে অমরনাথ হাত বাড়িয়ে দিলেন। একটা নতুন জিনিস হল, এবারে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ নয়, করমর্দন করলেন।

খুব শীঘ্রই অভ্যন্তরীণ মতগ্রহণ দলের কার্যালয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ভোটগণনার কাজ হবে পরের দিন। দিনের সব কাজ শেষ হলে অমরনাথ প্রমথকে ডেকে বললেন, 'ওহে শোন, তোমাদের সব কাজ আমি করে দিয়েছি। তোমাদের বলা হয়নি, আমি ভোরেই কলকাতা যাচ্ছি, মেয়ের বাড়িতে থাকব। ফোন নম্বর তোমার জানা আছে, এস-টি-ডি'তে ফলাফলটা জানিয়ে দিও...'

পরের দিন গণনায় দেখা গেল, প্রমথ সরকার সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে।

## ভ্রম সংশোধন

চতুরঙ্গ শরৎ ১৪০০ সংখ্যায় গৌরী আইয়ুব লিখিত ''জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবোধ'' প্রবন্ধে ১২৪ পৃঃ-তে শেষ লাইনে ''সত্য''-র পরিবর্তে ''সভ্য'' এবং ১২৮ পৃঃ-তে শেষের আগের লাইনে ''যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রকে আত্মদীপ হতেই হয়''-এর পরিবর্তে ''যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রীকে আত্মদীপ হতেই হয়'' পড়তে হবে।

# সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন বাংলার লোকসাহিত্য

বেণু দত্তরায়

বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালির প্রাণের সৃষ্টি। বাংলার হাজার-হাজার বছরের লোকায়ত প্রাণের ধারাই এগুলিকে সাজিয়ে বার করেছে। হয়ত কোন সুপ্রাচীন যুগে কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাতেই এগুলির সৃষ্টি হয়, তারপর লোকমুখে-মুখে সেগুলি গৃহীত-উচ্চারিত হতে হতে ক্রমে সাধারণ মানুষের প্রাণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এইভাবেই ব্যক্তির জিনিস হয়েছে সমাজের সম্পদ সম্পর্কে তাই সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় যে এগুলি ''of the people, by the people, for the people.'' বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কেও তাই বলা যায়। এগুলির মধ্যে লেগেছে বাঙালির প্রাণমন ও আত্মার স্পর্শ। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষের মুখে মুখে সেগুলি একালে এসে পৌঁছেছে। । এদের মধ্যে আছে আমাদের চারিত্র-ধর্ম, মন ও মনন, আমাদের সুখ-দুঃখ, বিবেক-বুদ্ধি, স্বপ্ন-সাধনা ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন।

বাঙালি মানস চিরকাল সমাজধর্মী ও মানবমুখী। আর্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব অতিক্রম করে বাঙালি জাতি ভিতরে ভিতরে তার এই জীবনধর্মী ধারাটি জিইয়ে রেখেছে। শুধু কি তাই ? বাঙালির প্রাণশক্তি আর্য-সভ্যতার ধারাকেও নিজের প্রাণধর্মের অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিতে ভোলেনি। এই সর্ববন্ধনমুক্ত ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তার মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকার ফলে বাইরের রাজবৃত্তের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের ধারা থেকে বহুদূরে নিশ্ছিদ্র সমাজবন্ধনের মধ্যে তার প্রাণের বিশেষত্বটি রক্ষা করেছে। তাই বৌদ্ধরাজ পাল বংশের শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার কালে বাঙালি যেমন নিজের বিশেষত্ব হারায়নি, পরন্তু শান্ত ঐতিহ্যকে গ্রহণ, স্বীকরণের-সমন্বয়ের মাধ্যমে সহজিয়া ধর্ম-দর্শনের সৃষ্টি করেছে তেমনি পরবর্তী সেন রাজাদের কঠোর শাস্ত্রাচার, বর্ণভেদ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। আবার তারও পরবর্তী যুগে, তুর্কি আক্রমণোত্তর কালে হোসেন শাহ প্রভৃতির হাতে তার এই সর্বসমন্বয়ধর্মী প্রাণধর্ম পেয়েছে নতুন মাত্রা। ইসলাম ধর্ম-প্রচারক রূপে এসময় যাঁরা দেখা দিলেন, সেই সুফিবাদী সাধকরাও এখানে হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রাণের সমন্বয়ী ধারাটিকেই সঞ্জীব করে তুললেন। এ যুগে স্বতন্ত্রভাবে যে ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়নি তা নয়, কিন্তু এক ঐতিহাসিক পটভূমিতে সমাজবদ্ধ সাধারণ মানুষ মিললেন এক সার্বজনীন উদার প্রেম-বন্ধনের আদর্শে।

তুর্কি আক্রমণের যুগ পেরিয়ে ঘটল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, যা বাংলার সাধারণ মানুষের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে করল আরও বেশি প্রসারিত। কঠোর বিধিবিধান, প্রথানুগত্যের পরিবর্তে চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন স্থাপন করল ভেদবুদ্ধিহীন বোধের। মাঝেমধ্যে অবশ্য মৌলবাদীদের প্রয়াস বাইরে থেকে একে ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে চাইলেও তা স্থায়ী হয়নি। স্থায়ী যে হয়নি, বাঙালি হিন্দু-মুসলমান যে লোকায়ত জীবনচেতনায় পরস্পরের সহবোদ্ধা ও সহমর্মী , তার প্রমাণ পাওয়া গেছে জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে। বাঙালির ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ফকির বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতি সেই লোকায়ত জীবনের প্রেমবন্ধনের স্বাক্ষর। ইংরেজ শাসকেরা এটি ধরতে পেরেছিল বলেই সুকৌশলে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বীজ রোপণে সচেষ্ট হল পরবর্তী যুগে। তাদের প্রয়াসে মোল্লাতন্ত্র ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা এগিয়ে এল একদিকে, স্থাপিত হল মুসলিম লীগ, অন্যদিকে উত্তর ভারতে দয়ানন্দ প্রভৃতির আর্য সমাজও সক্রিয় হল সে সময়ে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বাইরের দিকে এভাবেই শুরু হল ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির চক্রান্ত। সমাজের ভিতরদিকে সংহত সাধারণ মানুষের সমাজ কিন্তু তখনও দূরে থেকেছে। ইংরেজ -সৃষ্ট কৌশলের শিকার যে তাঁরা এত সহজভাবে হননি, তার কারণই হচ্ছে লোকমানসের উদার সমন্বয়ী দৃষ্টি। লোকায়ত সমাজ চিরকালই উদার। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে তাঁরা লড়াই করেন। তারই প্রকাশ দেখা গেল লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতায়, কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায়, হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকদের নানা সংগ্রামে। এই সমাজের হাতেই বাংলার লোকসাহিত্যের সৃষ্টি। এখানে কান পাতলেও তাই আমরা শুনতে পাব সম্পদ সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সুর। আমরা তাই দেখি বর্ণ-সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে এক আরক্তিম

আত্মীয়তা তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাংলার উপকথায় মানবপুত্র ও রাক্ষসপুত্রের দেখা পাই, লাল কুমার-নীলকুমারদের দল পাশাপাশি রাত জাগে। এর মধ্যে দিয়ে সকল প্রকার অবিবেকী মনুষ্যত্ববিরোধী ক্রিয়াকর্মের প্রতিরোধে মিলিত জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আমাদের গ্রামীণ জীবনে দেখি, গাজীর গাইন "আশা" হাতে নিয়ে দুরে বেড়ায়, সারাদিন ভিক্ষাবৃত্তি করে পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন করে। অভিজাত হিন্দু গৃহস্থের উঠোনে মুস্কিল আসান গাইতে এলে সমস্ত পরিবার শ্রদ্ধাপ্লুত মন নিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়, চাল-আলু-পান-সুপুরি-সিঁদুরের সিধে দিয়ে অভ্যার্থনা করে। বয়াতীর দল মহরমের অপেক্ষা করে — গাঁয়ে গাঁয়ে তাঁরা আসর বসান, হিন্দুমুসলমান উত্তরবাংলার আতিজাগার গানে রাত জাগেন। মুসলিম ফকির বা মুসলিম আসান সেখানে বর্ণসম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের উপকার করেন। কুষ্ঠিয়ার লালন ফকির থেঁকে মোমিনশাহীর জালাল আতরচানের সুরের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। বাংলার সত্যনারায়ণ সত্যপীর বা সৈতপীরের গানে বাংলার সাম্প্রদায়িক -ভেদবুদ্ধিহীন হৃদয় একত্র হয়। পীরের দরগায় মঙ্গল প্রার্থনা করে। উত্তরবাংলার সত্যপীরের পালায় যিনি প্রধান পরিচালক হন, তাঁকেও বলা হয় ফকির এবং তাঁরাও হিন্দু। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুরাই এই দল তৈরি করে। পরিচালকের পোষাক হয় মুসলমানের আলখাল্লা-জোব্বা, মাথায় মুসলমানি টৌপর। উত্তর বাংলার সত্যপীরের গানে শুনি —

হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পীর।
দুইকুলে সিন্নি পাই নাম সত্যপীর।

এমনিভাবেই বাংলার নৌকা বাইচের গানে সার বেঁধে দাঁড়ায় হিন্দু-মুসলমান। মৈমনসিংহ গীতিকার নায়ক-নায়িকাদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভেবুদ্ধিমুক্ত উদার প্রেম বর্ণ-বুদ্ধির উর্ধ্বে মাথা তোলে। মেদিনীপুরের পটুয়াদের গানে হিন্দুমুসলিমের সংস্কৃতি-সমন্বয়।

বাংলার বিষহরি পালার গানে মিলিত চোখের জলে ভাসে হিন্দু-মুসলমান, মহরমের গানে হাসান-হোসেনের আর্তনাদে কেঁদে ওঠে হিন্দুর হৃদয়। বাংলার লৌকিক গানের মধ্যে সারি গান এক বিশিষ্ট লোকসাহিত্য। সারিগান বলতে আমরা বুঝি নৌকা বাইচের গান। নদীমাতৃক পূর্ববাংলায় সাধারণত মোমিনশাহীতে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনই নৌকা বাইচের মহড়া হয়। এই নৌকা বাইচে সাধারণত "জলভরা", "নিমাই সন্ন্যাস " ও "ভোলান" গীত হয়। "সারিগানের বিষয় বস্তুর সবই হিন্দুয়ানী", বলেছেন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট গবেষক রওশান ইয়াজদানী এবং তিনি আরও বলেন "কিন্তু এর গায়ক গোষ্ঠীর শতকরা একশজনই মুসলমান।" জলভরাতে তো নির্ভেজাল হিন্দুয়ানী, তবু এর গায়িকা পল্লী অশিক্ষিতা মহিলাসমাজ। এইসব মহিলা লোকায়ত মুসলিম সমাজের। লক্ষণীয় এই যে, বাংলার উদার সমন্বয়ের এক মহান স্তম্ভ ছিলেন শ্রীচৈতন্য। তাঁকে নিয়েই এইসব মহিলাদের গান —

নিমের গাছে থাকরে নিমাই নিমের গুড়া খাইয়া।
(আমার) নিমাই কেনে হইলারে সন্ন্যাসী।।
নিমের গুড়া ফুরাইয়া গেলে মাও ডাকিবা কারেরে।
(আমার) নিমাই কেনে হইলারে সন্ন্যাসী।।

আমরা দেখি, বাংলার ঘাটু গানের বিষয়বস্তুতেও সবই হিঁদুয়ানী। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীই এর বিষয়বস্তু। প্রশ্নোত্তর জাতীয় গান থাকে এতে, আবার প্রশ্নোত্তর ছাড়া গানও থাকে। সেগুলিকে বলা হয় ছম গান। বিচ্ছেদ শ্রেণীর ছম গানে সেই চিরকালের রাধাকৃষ্ণ — এবং দেশভাগের পরেও বাঙালি মুসলমারে কণ্ঠে সেই গান শোনা যায়—

বইসে তামাল ডালে
কোকিলায় কি বলে গো রাই।

মুরলী শ্রেণীর ছম্ গানগুলিতেও কৃষ্ণের বংশীবাদন—

বাজায় বাঁশী কালশশী
ঐ যমুনার কূলে
ঐ যমুনার কূলে

পূর্ববাংলার মেয়েলি গীতগুলির কথা মনে আসে। এগুলি বিয়েশাদী উপলক্ষে গীতির আসরে গাওয়া। নতুন দামান্দের গীত, কইনা সাজানীর গীত, কইনা বাঘানীর গীত—সবগুলিতেই হিন্দুগৃহের ভাবনা প্রকাশিত। এগুলি মুসলমান মেয়েরাও গান করেন —

লুলুক দিয়া সই সাজাব
চিরতনমাত্র শেষে দিব, সইলো সই,
মনের মতন রাই সাজাব, যাও ও বিক্রবনে।
সীতা দিয়া সই সাজাব
সীঁথিমাত্র শেষে দিব, সইলো সই...

চৈত্রমাসে গ্রামের হাটে হাটে বারুনীর মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সেদিন খৈ-খেলনা-মিষ্টি কিনে আনে হাট থেকে। কিশোর রাখাল ছেলের দল গান বাঁধে, পথের কিনারে গামছা পেতে বসে, দল বেঁধে আবৃত্তি করে —

আক্ষি লো মেনা গাই
গোরখের নামে শিন্নী চাই।

গাজীর পটের গানগুলির মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত হৃদস্পন্দনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। গাজীর পট নিয়ে যাঁরা বাড়িবাড়ি গান করেন তাঁদের গানে থাকে ইসলামের ও রামায়ণ - মহাভারতের কাহিনী ও অন্যান্য লোকদেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার।



এগুলির মধ্যেও আছে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস। বাংলার বিভিন্ন স্থানে পটুয়া বা কুমোর নামে সম্প্রদায়ের মানুষেরা আছেন। এইসব পটুয়ারা না হিন্দু না - মুসলমান — দেবদেবীর পট নির্মাণ করে বলে তারা হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্যুত আবার মুসলমান সমাজও তাঁদের স্বীকার করে না। তাদের রামায়ণ বা মহাভারত বা গাজী পীর বা মহরম ইত্যাদি পটের সঙ্গে থাকে উপযুক্ত গান, সেগুলি তাদেরই রচিত — যার মধ্যে লোকায়ত মনোভাব — ধর্মভাবনা নয়। অর্থাৎ পটের ছবিগুলোর লোকব্যাখ্যা Folk-Explanation এই গানগুলি। গাজী পীরের গানগুলির কথা মনে করা যাক। একসময় গাজীমাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই য়ত এগুলি গ্রাম্য সমাজ গ্রহণ করেছিল — কিন্তু কোনও কোনও অঞ্চলে গাজীর গানে হিন্দু-মুসলিম বা অন্যান্য নিম্নবর্ণীয় সমাজের ব্যাঘ্রভীতি ও তা থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই এগুলি যৌথসমাজের মিলিত ফসল। এগুলিকে আমরা বলি Negative magic. বাংলর লোকায়ত জীবনের এক প্রধান বিষয় প্রেম। এই প্রেমের প্রবল আবেগেই লোকসমাজ-রচিত সাহিত্যকে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা-উত্তীর্ণ হতে দেখি। বাংলার মৈমনসিংহ গীতিকাগুলিও এই জাতীয় লোকসাহিত্য, এগুলি সচেতন লেখকদের শিল্পসাধনার ফল নয়। যদিও এগুলির মধ্যে কিছু কিছু কবির নাম যুক্ত থাকতে দেখি বটে, তবে হয়ত তাঁরা এগুলির আদি রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তা মৌখিক রীতির সাহিত্য এবং লোকমুখ থেকে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে, কোনও পুঁথি পাওয়া যায়নি। কোনও সাম্প্রদায়িক ধর্মের কাছে এই গীতিকা-র নারী চরিত্রগুলি প্রেমের ধর্ম বিসর্জন দেয়নি। এই প্রেমের আবেগই উত্তরবাংলার ভাওয়াইয়া গানগুলিকে সৃষ্টি করেছে, দোতারার লম্বা টানের গান, আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে যা বাংলার হিন্দুমুসলমানের যৌথ সম্পদ হয়ে উঠেছে।

বাংলার হিন্দুমুসলমানের ঐক্যভাবনার প্রকাশ তাদের বিবাহানুষ্ঠানের লোকাচারে ও তৎসম্পৃক্ত গানগুলির মধ্যেও বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বাংলার হিন্দুমুসলমানের বিবাহে উভয় ক্ষেত্রে ঘটকের আছে একটি বিশেষ ভূমিকা। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গায়ে-হলুদ প্রথা ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গানের মধ্যে ঠাট্টা-রসিকতা আছে। পান-সুপারি-বাতাসা দুই সম্প্রদায়ের কাছেই মঙ্গলের প্রতীক। গায়ে হলুদের পরে বরের হাতে যাঁতি ও কনের হাতে কাজলপাতা দেওয়া হয়। ঢেঁকি উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই মূল্যবান এবং মঙ্গলের প্রতীক। হিন্দু-মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের বিয়েতেই গ্রামের এয়োদের ঢেঁকি-মুঙ্গলায় অংশ নিতে ডাকা হয়। জনৈক বিশিষ্ট সমালোচক রফিকুল ইসলাম বলেন "বিয়ের সময় মুসলমান মেয়েরাও কোথাও কোথাও অনেকে সীমন্তে সিঁদুর পরে।" (পঃ বঙ্গ, ২০.৩.৮১)। ঢেঁকি-মুঙ্গলানোকালে মুসলিম সম্প্রদায়ের মেয়েদের গানে সংস্কৃতি সমন্বয়ের সুর প্রকাশিত হয় —

চোখ খুজি খুজি চোখে ছাই
ঢেঁকি মুঙ্গলানো দেখে যাই,
গাল ভরে পান খাই,
তাইতে ঢেঁকি মুঙ্গলে যাই।
মাথা ভরে তেল পাই।
সিঁথি ভরে সিঁদুর পাই।

হিন্দুর আইবুড়ো ভাতের সঙ্গে মুসলিমদের চাল দেওয়া রীতির মিল আছে — মাছ, মিঁষ্টি, দই উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানেই উভয়ের কাছে মঙ্গলের বিষয়। বাঙালি বিবাহে নাপিতেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। জাতিতে হিন্দু নাপিতকে উভয় সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই সিদে দিতে হয়। এইসব অনুষ্ঠানে যেসব গানগুলি হয় সেগুলি oral literature-এর অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে মনে আসে সুভাষ চন্দ্র রায় চৌধুরীর "পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বিবাহনীতি ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়" প্রবন্ধটির কথা। তিনি বলেন, "পঃ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী ও মুসলমান যদিও ধর্মগত দিক থেকে দুই ভিন্ন সমাজ যথাক্রমে হিন্দু ও অহিন্দু, কিন্তু ব্যাহাবাড়ির এই গানগুলিতে বিবাহরীতি অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন এক নিগূঢ় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যাতে রয়েছে সংস্কৃতির উপাদানগত সমন্বয়ের মহৎ ইঙ্গিত।" সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমানের এই যে নিবিড় সাংস্কৃতিক বন্ধন, বাংলার লোকসাহিত্যে তারই আত্যন্তিক প্রকাশ ঘটেছে। পৌষ মাসে লক্ষ্মীর ছড়া মুসলমান ফকিরেরা বাঙালি গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ঘুরে গান ও ভিক্ষা সংগ্রহ করেন—

লক্ষ্মীর পাঁচালী কিছু শুন দিয়া মন।
মন দিয়া শুন সবে লক্ষ্মীর বচন।

কান পাতলে শোনা যায় —

রান্ধিয়া বাড়িয়া যেই নারী পুরুষের আগে খায়।
ভরা না কলসের জল তরাসে শুকায়।
স্নান কৈরা যেবা নারী মুখে দেয়রে পান।
লক্ষ্মী বলে সেই নারী আমার সমান।

বাংলার মুসলমান রাখাল বালকরা কিছু ছড়া আবৃত্তি করে বলে তাদের মুখে মুখে লক্ষ্মী দেবী হয়েছেন লক্ষ্মী বিবি। দক্ষিণ-বঙ্গেও এই রকম বনদুর্গা হয়ে ওঠেন বনবিবি।

বাংলার নাথ সাহিত্যও মূলত লোকসাহিত্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে গানের কাহিনী দুটি লোকসমাজেরই সম্পত্তি এবং লোকঐতিহ্য-বিজড়িত সৃষ্টি। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে হিন্দুমুসলমানরা আছেন। তেমনি সৈত পীর বা সত্য পীরের গানেও মুসলমান কবির বন্দনা শুনি —

হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত।
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।

যমুনার তটে বন্দো রাসবৃন্দাবন।
কৃষ্ণবলরাম বন্দো শ্রীনন্দনন্দন
দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরানী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপুনি।

মোমিন শাহীর গীতেও আছে উদার সাম্প্রদায়িক সমন্বয়ের কথা —

সমবরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম এক মায়ের পুত।।

এই বিশিষ্ট জীবনদর্শনই লোকসাহিত্যের প্রাণ। লোকসাহিত্য এক উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, যুগে-যুগে সুখে-দুঃখে মানুষ যেখানে পাড়ি জমিয়েছে। এখানে শাস্ত্র নেই, শাস্ত্রাচার নেই, ধার্মিকতার ভড়ং নেই, বর্ণাঢ্য বা ধর্মান্ধ মানুষের আনাগোনা নেই। কেননা শত শত বছর ধরে বাংলার লোকায়ত গ্রামীণ সমাজের মানুষ যেখানে বাস করেছে, সেখানে পারস্পরিক আশা-আকাঙ্খা ও সামগ্রিক মেলবন্ধনই প্রধান কথা। যেখানেই অন্যায়-আচার-অত্যাচার, সেখানেই হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে। বিজাতীয় শক্তি যেখানে জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন করেছে, সেখানেই সাম্প্রদায়িক চেতনার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে তার প্রতিবিধান করতে চেয়েছে। এর প্রমাণ বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। ইংরেজ শাসনের আদিযুগে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীসহ আরও অন্যান্য সব সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষই মিলিতভাবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে। Civil Disturbances in India গ্রন্থে Dr. S. B. Choudhury লিখেছেন — "During the troubles of 1763, the Rangpur district, this time, held out for the fugitive Nawab and showed no disposition to accept the restoration of Mir Jafar." (P. 4)

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহের লীলাভূমি উত্তরবঙ্গ। ইংরেজের রাজস্ব সংগ্রাহক দেবী সিং-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেদিন উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায় যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ পাই উত্তরবাংলার কবি রতিরাম দাসের বর্ণনায় —

লাঠি নিল, খড়ি নিল নিল কাচি দাও।
আপত্য করিতে আর না থাকিল কাও।।
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল হালের জোয়াল।
জাঙ্গাল বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল।।
চারিভিত হইতে আইল্ রঙ্গপুরের প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজা

* * *

খিড়কির দুয়ার দিয়া পালাইল্ দেবী সিং।
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার চিং।।
দেবী সিং পালাইল্ দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা।।

লোকসাহিত্যে সেই সংগ্রামেরই সাক্ষ্য দেয়। তার গানে তাই মিলিত জীবনেরই পদাবলী। মৈমনসিংহ গীতিকার মলুয়া পালাটির সূচনাতেই দেখি বন্দনা অংশটি সেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন —

সভা করা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।

যদিও পালাটির লেখক হিসাবে দ্বিজ কানাইর নাম পাই, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কিন্তু মনে করেন, এই বন্দনা অংশটি মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত কবির রচনা।

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের লোকায়ত জীবনে যে উদার সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তার মূলে যে সুফিবাদের প্রভাব আছে, সেকথা প্রবন্ধের সূচনাতেই কিছু ইঙ্গিত করেছি। তুর্কি বিজয়ের বহু পূর্বকাল থেকেই সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম দিয়ে বহু আরবীয় বণিক ও ধর্মপ্রচারক তৎকালীন বাংলায় আসেন। তুর্কি বিজয়ের পরে তো আরও বর্ধিত হারে তাঁরা আসেন, এবং রাজশক্তির কাছ থেকেও সম্মান লাভ করেন। এঁদের দৈনন্দিন জীবনধারা, ধর্মপরায়ণতা, আদর্শবাদ, এবং সর্বোপরি মানবতাবাদ অস্পৃশ্য ও ব্রাহ্মণ্যশাসনে অতিষ্ঠ নাথপন্থী বৌদ্ধদের কাছে প্রশংসা লাভ করে। সুফিগণ যে মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর সাধনা করেন বাংলার লোকগীতিতে তা কখনো মুর্শিদী কখনও ফকিরালী বা মারফতী গান রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। এইসব গানগুলি সহজ মনের সৃষ্টি। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এগুলির মধ্যে এক উদার প্রাণ-ধর্ম ও সমন্বয়ের সুর প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, "The Old Bengali lyric tradition of which the oldest representation are the Charyya poems of the Siddhas (Nath Mendicants) attained itself in the Post-Muslim times (Songs of Vaishnavas) on the others and with a dash of the Islamic Spirit in it, became Muslim Baul Songs and Marfati or mystic or Islamic songs." (Dr. S. K. Chatterjee, JASB XIV 1943)

বাংলা চিরকাল প্রেমসাধনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে এসেছে। সব বিরোধ-বিস্বাদকে সে প্রেমের মন্ত্রে ছাপিয়ে গিয়েছে। শাস্ত্র সংস্কার তার কাছে কোনদিন বড় হয়ে ওঠেনি। হৃদয়ধর্মই তার কাছে বড়। বাংলার বাউল গানগুলির মধ্যে সেই প্রাণধর্মই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তা সরবে সাম্প্রদায়িকতাকে শুধু অস্বীকারই করে না, তার বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে ঘোষণা ছুঁড়ে





দেয়। লোকসঙ্গীতে তাই আত্মপ্রকাশ করেছে লালনের মধ্যে। বাংলা একাডেমী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'লালনশাহ ও লালনগীতিকা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রদ্ধেয় আবু তালেব বলেন, "তাঁর গানে উনিশ শতকের সেই সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার দিনেও এক অপূর্ব মানবপ্রেম ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

লালন জাত স্বীকার করেন না। তাঁর কাছে সব মানুষই এক জাতিভুক্ত। তাঁর গানে শুনি —

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
যবন কি কাফের, তার জাতের বিচার নাই।

লালন অকপ্ট কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন —

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না নজরে।।

* * *

বামুন চিনি পৈতেয় প্রমাণ, বামনি চিনি কিসেরে।
কেউ মালা কেউ তসবী গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার কালে জাতের চিহ্ন রয় কিরে।।

হিন্দু-মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই বাহ্য আচার-পন্থীদের হাতে তাঁকে বারবার নির্যাতিত হতে হয়েছে। তিনি ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলা হয়—ভণ্ড ফকির। অথচ ভণ্ডামি তিনি সইতে পারতেন না। ভণ্ড ফকিরদের লক্ষ করে তিনি বিদ্রূপভরে গান গেয়ে উঠেছেন —

নৈবিদ্যি পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা
সিন্নি বেলায় দরগাতলা
তাও দেখে মন খলবলায়।

লালন বলেন,

সবে বলে লালন ফকীর হিন্দু কি যবন।
লালন বলে, আমার আমি জানিনা সন্ধান।
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনি দিয়ে খেওয়া
কেউ খায় না কারো ছোঁওয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।

* * *

বিবিদের নাই মুসলমানী,
পৈতা নাই যার সেও বাওনী
বোঝোরে ভাই দিব্যজ্ঞানী,
লালন তেমনি খাতনার জাত একখান।।

এমনই অন্য গানে শুনি —

ফকীরী করবি ক্ষেপা কোন্ রাগে।
হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে।।
আছে বেহেশ্‌তের আশায় মোমিনগণ,
হিন্দুদিগের স্বর্গে মন,
টল কি অটল মোকাম নেহি
নেহাক করে জান আগে।

লালনের গানে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদঘোষণা।

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি প্রধান গান গম্ভীরা গান। গম্ভীরা উৎসব উপলক্ষে এইসব গানগুলি গীত হয়। এগুলিতে আছে সমাজসচেতনতার সুর। বাংলার লোকজীবনে সর্বপ্রকার অসঙ্গতি, অসাধুতা, ব্যভিচার, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সকল সংকীর্ণতা, সমাজজীবনের ক্ষুদ্রতা এগুলি গম্ভীরা গানে আত্মপ্রকাশ করেছে। গম্ভীরা গানের একটি প্রাচীনতম সংস্করণে দেখি, সিপাহী বিদ্রোহের পটে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি উঠে এসেছে —

গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়া কর্লে টোটা।
হিন্দু আর মুসলিমের বুকে মারা্য দিল খাঁটা।
জাতিধর্ম নাই এক ফাঁটা।

নিরক্ষর হিন্দু-মুসলিম কবিরা গান লেখেন। তাঁদের গানে শুনি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। তাঁদের সচেতনতার কথা। লোকসমাজ যত দূরেই থাকুকনা কেন, তাঁরা সমাজেরই মানুষ সুতরাং তাঁরা দেখতে ভোলেন না। এই হানাহানি-কাটাকাটি সংঘাত-বিরোধের মধ্যে একটি গম্ভীরা গানে শুনি মুসলিম কবির কণ্ঠ —

হায়রে আল্লা কি হোলো, হিন্দু-মুসলিম দুই মোলো।
দেখছি জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোরাণ দাঙ্গা-হাঙ্গামায়
পোলো।
মোসলেম কোহছে "হাম বোড়ো", হিন্দু দেয়নাক সাড়া।
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো।।

আই-হোর ঝড়ু, খলিফার গম্ভীরা গানে পাই —

হামরা নাচতুক দুয়োভাই গান গাইতুক মিলা্য মিশ্যায়।
এখন মুসলমানে নাচনে গাইনে মসজিদে টাকা ঢালো।।
মুসলমানের মৌলবী হিন্দুর পণ্ডিত আজগুবি।
শিব ভায়ে ভায়ে, ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে ঘর ভাঙ্গা্য দুখান করলো।।

মুসলিম রাজা হোসেন শাহের প্রশংসা করে হিন্দু লোককবি গান ধরেছিলেন,

এমন রাজা আর হবেনা প্রজার কত ভাগ্যবল,
ধনেধ্যানে জ্ঞানে-মানে ভাগ্যলক্ষ্মী সদা অচল।
জাতধরমের নাই ঠিকানা হিন্দু মুসলেম জানা যায়না।
কোরাণ পুরাণ সবই জানা অঙ্গে টুটে দেবজ্যোতি।।

ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক প্রেমধর্মের উদাহরণ দিতে গিয়ে কয়েকটি গান উদ্ধার করেছেন — যার পেছনে ছিল মহরমের তাজিয়া ও গম্ভীরার মধ্যে গোলমাল। গ্রামের মুসলিমরা ঢাক ভাঙে, হিন্দুরাও ভাঙে তাজিয়া। লোক-কবিরা গাইলেন —

১। ধর্মের যাই বলিহারি/ধর্ম নিয়া চলছে কিসের অত
আড়াআড়ি।
আল্লা ঢাকের বোলে চটি তোলে, আজানে কিষ্টো পলায়।

২। কুধে আল্লা ভগবান, ফুঠে আছে আদ্যের থান।
মন্দিরে কি মসজিদেতে পূজা সিন্নি খান,
তোমার নূরেতে কি টিকিতে বোস্যা তসবীর কি মালা
ঘুরায়

৩। যত ওপরে যাব ভাই জাত কোহতে কিছু নাই
একের জন্যে সবাই পাগল তকে চাহে সবাই
যত নীচের পাগল হয়্যা ছাগল ধর্মেতে শুধু ধাঁধায়।

আলকাপ শ্রেণীর গান মালদহ-মুর্শিদাবাদ-দিনাজপুর-রাজসাহী জেলার বহুপ্রচলিত একরকমের লোকসঙ্গীত। বাংলার নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলাতেও আলকাপের প্রচলন দেখা যায়। আলকাপ যে বাংলার লোকজীবনে সমন্বয়ের এক আদর্শ নিদর্শন, তার প্রমাণ হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নানা ''খলিফা'' বা ''ওস্তাদ'' এইসব দল গঠন করেন। বীরভূম ও মালদহ জেলায় আলকাপ ওস্তাদ মনকির হোসেন, সুবেদার বিশ্বাস, সুধীর দাস, নৈমুদ্দিন, আলতাফ বিশ্বাস, আব্দুর রাজ্জাক প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকার বা ঝাঁকসুর নামও মনে আসে। এইসব নামগুলি মনে করিয়ে দেয় যে, আলকাপের গানে আছে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সমান ভূমিকা। সর্বপ্রকার বিকৃতি-বিকার, সমাজজীবনের নানা দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সুস্থ সমাজবোধের যে আন্দোলন আজ মানুষের জীবনে চলেছে আলকাপে তার বলিষ্ঠ রূপায়ণ লক্ষ করি। ঝাঁকসুর লোকসঙ্গীতে পাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বলিষ্ঠ উচ্চারণ —

এক থেকেই দুই হয় দেখো বিচার করি
যাকে খোদাতাল্লা তাকেই বলে হরি
তবে কেন ভায়ে-ভায়ে করবো মারামারি
বিচার করে দেখুন তার আসরের নরনারী।

আবার কোনও আলকাপে বা লেটো ছড়ায় শুনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি সুর —

আমরা ভাই-ভাই হিন্দু মুসলমান
এক মাটিতে বাস করি,
এক সুরে গাই গান,
আমরা হিন্দু মুসলমান।

আলকাপের গানের মত বাংলার আরেকটি গান টুসু গান। বাংলার প্রাচীন সমাজের পূজিতা টুসু এক শস্যের দেবী। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে তিনিই তোষলা দেবী, এবং তাঁর ব্রত টুস-টুষলী বা তুষ-তুষলী ব্রত। টুসু পরবের সব গানে দেবী-মাহাত্ম্য থাকলেও বাংলা লোককবিদের হাতে তা ব্যবহৃত হচ্ছে নানা রাজনৈতিক তাৎপর্যে। কোনও গানে দেখি মানভূমের বাঙালি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিহারী সম্প্রদায়ের অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদ —

শুনরে বিহারী ভাই,
তোরা রাখতে নারবি ডাঙ্ দেখাই,
তোরা আপন-পরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই
ভাইকে ভুলে করলি বড়
বাংলা বিহার বুদ্ধিটাই।

সচেতনতা লোকসাহিত্যের প্রাণ। দেশের দশের নানা অবস্থার দিকে সে নজর রাখতে ভোলে না। সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাকে বাংলা লোকসঙ্গীত আঘাত হানতে ভোলে না। উত্তর বাংলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের একটি গানে শুনি সময়োচিত ক্ষোভ —

আসামেতে হইল গোল
বাঙ্গালী তাড়াও —
বিদেশীয়া ওবার বাদে দেশে ফিরিয়া যাও
আসাম বলে বিদেশী তাড়াও !

কোনও লোকসঙ্গীতে শুনি —

মন মোর পাগল হলুরে শুনিয়া হাহাকার
সোনার ভারত করল শ্মশান একি অবিচার
ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি তলেতলে খুনোখুনি
রাজনীতির ভাই চলছে বাহার
তাই দেখি, ভারি মনে ভাসব বুঝি দুখসাগরে
সংসারে থাকা বড়ো ভার।

সাম্প্রদায়িকতা, কুৎসিত হানাহানির বিরুদ্ধে বাংলার মিলিত জীবনের এমনিতর প্রাণস্পন্দন ধ্বনিত হচ্ছে গানে। নিম্ন দামোদর অঞ্চলের ময়ূরপঙ্খী গানেও সেই সুর দেখতে পেয়েছেন গবেষক। উৎসব উপলক্ষে এইসব গানগুলি গীত হয় সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির বা মকর সংক্রান্তির স্নানের দিন। এতে হয় গানের লড়াই। একজন গবেষক রফিকুল ইসলাম বলেন, ''ময়ূরপঙ্খী গানের শ্রোতা হয়ে অবশ্যই গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু লোক নদীর ঘাটে উপস্থিত থাকতেন। আরও ধারণা হয় যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের মানুষই মকর সংক্রান্তি উৎসবকে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নিয়ে বাংলার পল্লীজীবনের আনন্দকে উপভোগ করে এই প্রমাণ করেছে যে



আমরা সবাই বাঙালী — আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতিতে বাইরের দিকে কিছু পার্থক্য থাকলেও অন্তরে ফারাক নেই।''

(পঃ বঙ্গ, ৬/৬/৮০)

বাংলার লোককথাগুলির কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে আসে। এইসব লোককথাগুলি বৃহত্তর সমাজের সৃষ্টি বলে এবং সমাজ-মানসেই তা জীবন্তভাবে বিধৃত বলে এগুলি কখনও কৃত্রিম হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা লোকসাহিত্যের এক অসামান্য গবেষক অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথাগুলি সম্পর্কে আলোচনাকালে যে কথা বলেছেন সে কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার — ''বাঙালির জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান গুণ এই যে, যখন হইতে বাঙালী একটি বিশিষ্ট জাতিরূপে গড়িয়া উঠিবার মত শক্তি লাভ করিল, তখন হইতেই ইহা ধর্ম-বিষয়ক সকল অন্ধতা বা গোঁড়ামী হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার মত শক্তির অধিকারী হইয়াছিল। ভারতীয় সনাতন ধর্মের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিদ্রোহী সন্তানই বাঙ্গালী। ...সেইজন্য তাহার সাহিত্যিক প্রেরণা ধর্মবোধের দ্বারা কোনদিন রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে নাই।'' (বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড — কথা) মনে হয় এজন্যই বাংলার লোককথাগুলির মধ্যে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক জীবনধর্মের অনুপস্থিতি। কমবেশি সার্থক লোককথার ধর্মই এই। এগুলির কোনও বিশেষ জাতি নেই, তেমনই এগুলির মধ্যে বিশেষ কোনও ধর্মও নেই বলে এগুলি ঋজু। কোনও প্রকার ধর্মীয়তা গোঁড়ামী বা বর্ণান্ধতার এরা ধার ধারে না। কথাসাহিত্যের মধ্যে যেমন একটি বিশেষ দেশের সমাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লোককথা-সাহিত্যের মধ্যে তা থাকেনা, এবং এজন্যই এগুলির আবেদন দূরবিস্তৃত। এখানে দেখি, দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি খল চরিত্রের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছে। যেখানে দৈহিক শক্তির অভাব, সেখানেই বুদ্ধিবলের সাহায্যে সে প্রাধান্য লাভ করেছে। অত্যাচারী শক্তিও তো একটি সম্প্রদায়। এবং সেই বলদর্পী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বাঘকে বুদ্ধিহীন ভাবে সাজিয়ে বাঙালি মানস টুনটুনি পাখির দ্বারা তার উপরে জয়ের ঘোষণা করে আনন্দ পেয়েছে।

সাধারণভাবে কবি গানকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। যারা এই মতের সমর্থক তাঁরা মনে করেন এগুলি নাগরিক গীত সাহিত্যের মধ্যে পড়ে যার সূচনা অষ্টাদশ শতকে। চাতুরি, নাগরিকতা, অশ্লীলতা, তাৎক্ষণিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রভৃতি লক্ষণ তাঁরা এগুলির মধ্যে দেখেছেন। এদের রচয়িতারাও কেউ অনামী নন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, নাম তো অনেক লোকসাহিত্যের লেখকেরই পাওয়া যায়। গম্ভীরা-আলকাপ-ময়ূরপঙ্খী-টুসু প্রভৃতি গানের গায়কেরও নাম পাওয়া যায়। লোকায়ত সমাজেরই সৃষ্টি বলে তবু এগুলিকে বলা হয় লোকসাহিত্য। আমাদের কবিগানগুলিও তো মুখে মুখে আসরের মধ্যে রচিত এবং এগুলির সৃষ্টির মূলেও আছে আমাদের ঝুমুর গান। এইসব দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সার্থকভাবেই শ্রীমতী প্রথমা রায় মণ্ডল কবিগানগুলিকে লোকসাহিত্যের মধ্যেই ফেলেছেন। এগুলি সম্পর্কে তিনি বলেন, নাগরিক মনের কাছে এরা অশ্লীল মনে হলেও আসলে তা গ্রাম্যতারই লক্ষণ। আর শ্রীমতী রায় মণ্ডল কবিগানের চাতুরিকেও নাগরিকতার লক্ষণ বলে মেনে নেননি। আমাদের প্রবাদ ধাঁধাগুলির মধ্যেও আছে চাতুরি। কবি গান সম্পর্কিত তাঁর আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, কবি গানেও ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মনোভাবের প্রকাশ। লোকসাহিত্যের মহান গুণ ধর্মনিরপেক্ষতা তিনি দেখতে পেয়েছেন কবিগানেও। এন্টনি ফিরিঙ্গির একটি গানে এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মনোভাবের সুর শোনা যায় —

খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এ-ও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানবজনম হবে যদি রাঙা চরণ পাই।

বাংলাদেশের রমেশ শীলের একটি গান —

ওস্তাদের নাই জাতবিচার,
ভাই, হুঁশিয়ার,
তারা হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়।
মানুষরূপে জানোয়ার।

বাংলার সঙের গানগুলি সংগ্রহ করে শ্রদ্ধেয় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাজ করেছেন, তার জন্যে আচার্য সুনীতি-কুমার তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন — ''He has drawn our attention to this distinctive aspect of Bengali Folk literature and Folk poetry.'' এই লোকগানগুলির মধ্যে অপরিচিত বাঙালি লোকগায়কদের কণ্ঠে শ্লেষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকালের সকল ধর্মাবলম্বী মানুষদের ঐক্য-সম্প্রীতির কথা জোরালোভাবে বলা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''কোন কোন সাম্প্রদায়িক দল ও নেতাদের প্রকাশ বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্যের ফলে বিশেষ করে হিন্দুমুসলমানের মিলন সেদিন এক বিরাট সমস্যায় পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বিভিন্ন সময়ে বিষময় ও বিভীষিকাপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে বহু নিরীহ নরনারী ও শিশু প্রাণ হারিয়েছিল। বাংলাদেশের সঙের দল শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা রঙ্গরস পরিবেশন করেই কর্তব্য শেষ করেনি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নাগরিকদের মধ্যে প্রীতি ও সংহতির জন্যও উদ্যোগী হয়েছিল।'' গানে এগুলিকে যেমন আঘাত করা হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে-সঙ্গে নানা স্বার্থপর নেতাদের জঘন্য কার্যকলাপের

বিরুদ্ধেও মানুষকে সচেতন করে দিয়েছে। শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, অনেক সময় হিন্দু-মুসলমান পল্লীবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানের মিলনের উপরে জোর দিয়ে সঙের মাধ্যমে প্রচার চালিয়েছিলেন। এসব গান শোনার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষই ভিড় করতেন। সঙের মিছিলে শুধু যে হিন্দুরা থাকতেন, তা নয়, কলকাতা শহরের ঘোড়ার গাড়ির চালক কোচোয়ান প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদেরও দেখা যেত। কোনও কোনও সঙের মিছিলে মুসলমান গায়কবাদকরাও যোগ দিতেন। তাঁর কৃত বিবরণ থেকে দেখা যায়, সেকালে কলকাতার হ্যারিসন রোডে বহু পেশাদার ব্যান্ডপার্টি ছিল, এইসব দলের অধিকাংশ বাদক ও কর্মীরাও ছিলেন মুসলমান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শনরূপে তিনি কয়েকটি গানেরও উল্লেখ করেছেন —

হুঁশিয়ার হুশিয়ার বিদেশী তস্কর,
সজাগ হয়েচে দেশবাসী, মজুর-চাষী-লস্কর।
* * *
হিন্দু-মুসলমান গায় স্বরাজের গান
আমরা সবাই হয়েছি এক প্রাণ।

এমনিতর সঙের আরেকটি গানে দেখা যাচ্ছে —

শত-বিরোধের বাণী নিয়ে যারা করে কানাকানি,
তাদের চোখে যেন পড়ে শুধু ছানি,
একতা ছাড়া স্বরাজ হবে না।
হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান,
সবার এই দেশ, সবার এ স্থান,
সবার তরে মোরা স্বরাজ চাই।

হাওড়া খ্রুরুটের একটি গানে —

বিভেদজ্ঞান ভুলে রে ভাই, আয় না সবাই সে গান গাই

ঢাকার ইসলামপুর মিছিলেরও একটি গান —

হিন্দু-মুসলমান জাগরে সমান, প্রাণে প্রাণে বেঁধে রাখ
কষিয়া
ঘুম ভাঙ্গ দেশবাসী মিলিয়া
দেখ দেশের ধন কাহারা যাইতেছে লুটিয়া।

ঐক্য ও সমঝোতার ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য চিরকালই প্রশংসনীয় কাজ করে এসেছে। বাংলার লোকসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সন্ধানী গবেষক মুহম্মদ মুনসুরউদ্দীন সাহেব, "হারামণি" গ্রন্থটি যিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে সংকলন করেছিলেন, তিনি বলেন, "জাতীয় আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান হল পারস্পরিক সহানুভূতি।... আজকের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন সর্বজাতীয় সমঝোতার।... পৃথিবীর সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যেই এমন একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে যা এই কুটুম্বিতার বিশেষ সহায়ক।" মুনসুরউদ্দীন এই লোকসাহিত্য সংগ্রহেই আবেদন জানিয়েছিলেন আমাদের কাছে — "লোকসাহিত্যের বিরাট সংগ্রহ আজ চাই-ই চাই। কারণ এইখানে হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমানী ঢঙের সুর ও ভারতীয় ঢঙের সুরে এক গভীর যোগাযোগ ঘটেছে আমাদের লোকসঙ্গীতে। এই পল্লী-সাহিত্যেই অতি সহজে ধরা পড়বে ভারতীয় যোগসাধনা ও মুসলমানী সুফীবাদের মৌল ঐক্য। ভারতীয় সাধনার বৈষ্ণবীয় ভাবধারা কী ওতপ্রোতভাবে মুসলমানী লোকসাহিত্যে মিশে গেছে এবং আবার মুসলমানী ভাবধারা কিভাবে ভারতীয় লোকসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে লোকসাহিত্যে।"

প্রবন্ধটির জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। শারদীয় নন্দন, ১৩৯৭।
২। মোমিনশাহীর লোকসাহিত্য, রওশান ইয়াজদানী।
৩। বাংলার লোকসাহিত্য, উপকথা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
৪। লোকসাহিত্য, আশরফ সিদ্দিকী, বাংলা একাডেমি ঢাকা।
৫। রফিকুল ইসলাম, পঃ বঙ্গ পত্রিকা, ২০.৩.৮১।
৬। Civil disturibances in India, Dr. S. B. Choudhury.
৭। Dr. S. K. Chatterjee. JASB XIV (1943)
৮। লালন শাহ ও লালনগীতিকা, আবু তালেব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৯। ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ, গম্ভীরা
১০। আলকাপের গান, ফণী পাল
১১। বাংলার ময়ূরপঙ্খী গান, রফিকুল ইসলাম, পঃ বঙ্গ পত্রিকা, ৬.৬.৮০।
১২। শ্রী প্রথমা রায় মণ্ডল, কবি গান, পঃ বঙ্গ পত্রিকা
১৩। শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাউলার সঙ।
১৪। হারামণি, মুহম্মদ মুনসুরউদ্দীন,
১৫। ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়।

# আধুনিক বাংলা গান : একটি পর্যালোচনা

সুভাষ বাগচী

একটা ঘটনা লক্ষ করা যাক। উঠতি বা একটু-আধটু নাম-টাম করেছেন এমন একজন কবি— ধরা যাক শান্তনু, বয়স ৪০/৪৫, শিক্ষিত ও সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি সচেতন। তাঁকে আমি এই পদ্যটা শোনালাম —

এসেছিলো প্রেম একবারই
নীরবে দুয়ার প্রান্তে
নিরুপায় ছিলো সেকি হায়
কভু পারিনিকো জানতে।

ওঁর প্রতিক্রিয়া আপনি এই মুহূর্তে নিজেকে দিয়েই ভাল বুঝতে পারছেন।

কিন্তু, এরকম একটা চরম বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার দিন দুই পর ধরা যাক শান্তনু অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। নিদিষ্ট স্টপে বাস থেকে নেমে বাড়ির রাস্তা ধরে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ রাস্তার পাশের কোনও এক বাড়ি থেকে আকাশবাণী কলকাতার সোয়া ছ'টার বিবিধ ভারতীর 'মনের মতন গান' অনুষ্ঠানে রেডিও থেকে ভেসে এল কোকিলকণ্ঠী লতার গলায় এই গানটা — 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে, আমারই দুয়ার প্রান্তে.....'। বলাই বাহুল্য, শান্তনু নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়বেন সেখানে এবং অতি অবশ্যই গানটা শুনবেন মন দিয়ে। তৃপ্ত হবেন।

কেন এমন হয় আজও ? আসলে, সমস্যাটা এখানেই ; বলা ভাল, প্রশ্নটা এই গানের ব্যাপারেই। শান্তনুদের দোষ নেই। যে কোনও গানেই, বিশেষত ভারতীয় সঙ্গীতে, সুর ও মেলডির গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম। প্রধানও বটে। আর জীবন্ত কিংবদন্তী লতা মঙ্গেশকর-এর কণ্ঠে ঐরকম একটা মেলডি পাশের বাড়ি থেকে ভেসে এলে আমাদের বয়সী গানপ্রিয় চোরও কিছুক্ষণের জন্য চুরি করার কথা ভুলে যাবে। ঐ মাথাখাওয়া সুর অন্যমনস্ক করে দেবে তাকে। না, শান্তনু বা চোর— গানটির বাণী শোনার জন্য কেউ দাঁড়ানি। অনবদ্য সুরই তাঁদের দাঁড় করিয়েছে। অন্যমনস্ক করেছে। আর শুধু তাঁদেরই বা কেন, যদি বলি পঙ্কজ মল্লিক, শচীন দেব বর্মন, হিমাংশু দত্ত, অনুপম ঘটক, নচিকেতা ঘোষ, রবীন চাটার্জী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়,মান্না দে ইত্যাদি প্রতিভাবান সুরকারদের সুর যুগের পর যুগ একটা সমগ্র জাতিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, অন্যমনস্ক রেখে কোনও দিন ভাবতে পর্যন্ত দেননি সচেতনভাবে গানে কোন্ বিষয়, কোন্ কথা তাঁরা শোনাচ্ছেন শ্রোতাদের তাহলে কি ভুল বলা হবে ? তাহলে কি এটাই ধরতে হবে যে শান্তনুদের মতো শিক্ষিত আধুনিক রুচিবান ব্যক্তিদের কাছেও গানের কথা — আধুনিক গীতিকবিতার কোনও মূল্য নেই ? নাকি আধুনিক বাংলা গানের গড়পড়তা শ্রোতার এই ধরনের গান শোনার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ অভ্যাসের অন্যমনস্কতা অজান্তেই কাজ করে চলেছে ?

অন্যমনস্কতাকে সাধারণত একটু ক্ষমার চোখে দেখা হয়ে থাকে। সম্ভবত শৈশব আর কৈশোরের ধর্ম বলে বোধহয়। কিন্তু একটা গোটা জাতির অধিকাংশ ব্যক্তিই যদি এই একটি প্রশ্ন অর্থাৎ এই গানের ব্যাপারে তার শৈশব বা কৈশোর কাটিয়ে না উঠতে পেরে থাকে আজও, তাহলে সেটা 'সতিই চিন্তার বিষয়' বলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দায়িত্ব আর এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কোনও শিল্প-সচেতন (বলতে চাই কনসার্নড্) ব্যক্তির পক্ষে আজ আর সেটা সম্ভব নয়। শুধু এই অন্যমনস্কতাবশত অধিকাংশ বাঙালি শ্রোতা আজও রবীন্দ্রনাথের গানকে আধুনিক বাংলা গান বলে মেনে নিতে পারেন না। তাই আমার মতে এই অন্যমনস্কতা অমার্জনীয়।

## সংজ্ঞা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি

যাই হোক, এবার আমার মূল বক্তব্যে আসি। বিষয় 'আধুনিক বাংলা গান'। কিন্তু প্রথমেই সংজ্ঞা-সংক্রান্ত একটি বিভ্রান্তি। বাংলা ভাষায় ( শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাইরে ) গান তো অনেক রকমের। আধুনিক বাংলা গানটা তাহলে কোন্ রকমের ? এমনিতে তো, বলাইবাহুল্য, পল্লীগীতি ( বা লোকগীতি ) শ্যামাসঙ্গীত, গণসঙ্গীত, বৃন্দগান, কীর্তন, পুরাতনী, রামপ্রসাদী এসব এর আওতার বাইরেই পড়ে। কিন্তু ওমনিতে, প্রচলিত ধারণায় ( কীভাবে এটা হল কে জানে ), রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের গান, হিমাংশুগীতি বাদ দিয়ে যাবতীয় গানই হল আধুনিক বাংলা গান —কোন্ যুক্তিতে এটা মানা যায় বোধগম্য নয়। এ এক অদ্ভুত

সংকট। যে গান কোন্ অর্থে আধুনিক বুঝতে পারি না সেই গানই আমাকে পর্যালোচনা করতে হবে।

## আকাশবাণী এবং রেকর্ড কোম্পানির ভূমিকা

সম্ভবত বিশের দশকের শেষ দিকে বা ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে আকাশবাণী ও রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা আধুনিক গানের ঐ বিচিত্র অযৌক্তিক সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই কাজী নজরুল ইসলামের তৈরি গানের কথা বলতে হয়। নজরুল '২৭-'২৮ সাল থেকে রেকর্ড কোম্পানির জন্য ফরমাইসি গান লেখা ও সুর দেওয়া শুরু করেন। বাংলা গজলও তিনি ঐ সময় থেকে লিখতে আরম্ভ করেন। লেখকের ঠিক জানা নেই সেই সময় থেকেই এই গানগুলি নজরুলগীতি আখ্যা পেতে শুরু করেছিল কিনা। তবে, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে নজরুল-সৃষ্ট অধিকাংশ গানই যে আধুনিক গান ছিল সন্দেহ নেই। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, আঙুরবালারা তখন সেসব গান গেয়েছেন। কিন্তু, মানসিকতা ও সৃষ্টিতে আধুনিক হয়েও রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত কখনও ঐ ধরনের ফরমাইসি গান লিখেছেন বলে শুনিনি। যাই-হোক, নজরুলের গান সম্বন্ধে বলা যায় যে এই প্রতিভাবান (মূলত) স্বভাব-সুরকার ও কবির যাবতীয় সৃষ্টি (গান) বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে 'নজরুলগীতি' হিসাবেই, আধুনিক গান হিসাবে নয়।

রেকর্ড কোম্পানি ও আকাশবাণীর তরফ থেকে জ্ঞান গোঁসাই, ভীষ্মদেব-দের গাওয়া কথার গাঁটে গাঁটে সিটকিরির প্যাঁচালো নক্সাকাটা তানসর্বস্ব গানগুলিকে আধুনিক গান নামে প্রচার শুরু হল। আজও 'হারানো দিনের গান' বা 'সেদিনের গান' অনুষ্ঠানগুলিতে আকাশবাণী থেকে ঐ তানসর্বস্ব রাগাশ্রিত গানগুলিকে সে যুগের আধুনিক গান বলেই প্রচার করা হয়ে থাকে। আর আমরাও জানি, আমাদের বাবা-কাকাদের যৌবনে ঐ গানগুলি জনপ্রিয় আধুনিক হিসাবেই পরিচিত ছিল। অথচ, তথাকথিত ঐ বিশেষজ্ঞরা একটু মনোযোগেই লক্ষ করতে পারতেন ( আজও করা যায় ) যে রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদ ইত্যাদির গানে তো বটেই, এমনকি পুরাতনী হিসেবে চিহ্নিত নিধুবাবুর টপ্পাতেও আধুনিকতার উপাদান — সুরের সোফিস্টিকেশন ও কথায় আরোপিত গুরুত্ব — ঐ-সব সিটকিরিমার্কা, শুধুমাত্র কথার জন্য কিছু অপ্রাসঙ্গিক অবাস্তব শূন্যগর্ভ কথা দিয়ে তৈরি গানের থেকে অনেক বেশি ছিল। সুর ও কথার বিচারে নিধুবাবুর গান ছিল তাঁর সময়ের আসল আধুনিক গান। একটি রাগের বন্দিশের ঘাড়ে কিছু নাম-কা-ওয়াস্তে কথা বসিয়ে তাদের মাঝখানে মাঝখানে বেশ কিছু তান বা পাল্টার মন পুর পুরে দিয়ে যে সব গান বছরের পর বছর রেকর্ড কোম্পানি ও আকাশবাণী আধুনিক গান বলে চালিয়ে গেছে সেসবের তুলনায় এমনকি নিধুবাবুর গানে পঞ্জাবি টপ্পার রূপান্তরিত পরিশীলিত প্রয়োগ সে-যুগের প্রেক্ষিতে সুরের বিচারে অনেক বেশি সৃষ্টিশীল ও আধুনিক। যে যুগে শহুরে বাবু সংস্কৃতি হাফ্-আখড়াইয়ের চরম অপসংস্কৃতির নয়ানজুলিতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় খাবি খাচ্ছে, সে যুগের কথা ভাবলে নিধুবাবুর গানের কথাও, ভাবে-ভাষায়, যথেষ্ট আধুনিক। বাংলা গানে সোফিস্টিকেশন প্রথম নিধুবাবুই আনেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের গান হয়ে ওঠে এ-গান। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এ-গানকে আধুনিক বলল না। তারপর একে একে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্র-অতুলপ্রসাদ-নজরুল-রজনীকান্ত হয়ে হিমাংশু-গীতি পর্যন্ত—এঁদের গানকেও আমরা আধুনিক বলতে পারলাম না। কোন্ যুক্তিতে ? অথচ, 'ভালবাসা মোরে ভিখারী করেছে তোমারে করেছে রাণী' থেকে শুরু করে 'পান্নবিনী গো সঞ্চারিনী, মোনো না দিয়ে আর পারিনি' হয়ে 'মনে পড়ে রুবী রায় কবিতায় তোমাকে', বা 'এ্যাই, এদিকে এসো কথাটি শোনো' পর্যন্ত যাবতীয় গান পেয়ে গেল আধুনিক গানের আখ্যা ; — সেটাই বা কোন্ যুক্তিতে? আসলে যুক্তি-যুক্তির কোন ব্যাপার ছিল না, নেই এর মধ্যে। তবে, যুক্তিবিহীন আলটপকা ভাবনা একটা আছে ; সেটা হল — যখনই কেউ নিয়মিত নিজের লেখা কথায় নিজেই সুর দিয়ে গেছেন অন্য কারও কথায় সুর দেননি বা কারও সুরে কথা বসাননি, তখনই সেটা হয়ে গেছে তাঁর গান। আবার এখানেও অন্তত একটি গোলমেলে ব্যাপার আছে। সুরসাগর হিমাংশু দত্ত নিজে গান লিখতেন না। অজয় ভট্টাচার্য, যাযাবর আরও কেউ কেউ তাঁর জন্য গান লিখেছেন। অথচ তাঁর সুর দেওয়া গানগুলি 'হিমাংশু গীতি' নামে পরিচিতি পেল। কোন্ যুক্তিতে ? এটা ঠিক যে প্রতিভায় উনি সমসাময়িক অন্য সুরকারের চেয়ে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। আধুনিক বাংলা গানে পাশ্চাত্য আধুনিক সঙ্গীতের ওরকম সুনিপুণ প্রয়োগ তাঁর সময়ে আর কেউ করতে পারেননি। তাছাড়া নিজস্ব একটা ধারা তো ছিলই বলা বাহুল্য। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের আধুনিক ধারাটিকে আত্মস্থ করে কীভাবে সেটিকে বাংলা আধুনিক গানে প্রয়োগ করেছিলেন তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ হল শ্যামল মিত্রের গাওয়া 'তোমারি বিরহে জানি গো জানি, রচিনু যে গান, হে নিরুপমা' গানটি। তাহলে কি এটা মেনে নিতে হবে যে বিশেষ সম্মানার্থেই 'সুরসাগরের' সৃষ্টিকে 'হিমাংশুগীতি' আখ্যায় ভূষিত করা হল ? তাহলে, সলিল ও নচিকেতা ঘোষেরও একই সম্মান জোটা উচিত ছিল !

যাই হোক, এটা ঠিক যে নিজের লেখা কথার জন্য নিয়মিত সুর করতে করতে সুরকারের নিজস্ব একটি ধারা (idiom) তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে সেটাকে আধুনিক বলতে বাধা কোথায় ? বাধা ছিল। বোধের অভাব তো এক ধরনের বাধাই সৃষ্টি করে। তখনকার বিশেষজ্ঞদের সে আকাশবাণীরই হোন বা



রেকর্ড কোম্পানির — বোধ একটা ব্যাপারে সঠিক জায়গাতেই ছিল বোঝা যায়। ওঁদের সৃষ্ট গানের তুলনায় আধুনিক গান ( রামের কথা, শ্যামের সুর ) অতান্ত নিম্নমানের হওয়ায় সেসব গনের কৌলিন্য রক্ষার্থেই ওগুলোকে আধুনিক বলা থেকে বিরত থেকে যাঁর যাঁর গান তাঁর তাঁর নামের লেবেল এঁটে দিলেন। আর শ্রোতারাও বুঝদার-অজ নির্বিশেষে ওঁদের কথা বেদবাক্য ধরে নিয়ে, এটা স্তুতি না অজান্তেই ব্যাজস্তুতি সেটা না বুঝে, রবীন্দ্রনাথের লেখা—

"আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।।
ভরে রইল বুকের তলা কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।।
আমার চোখে ঘুম ছিলোনা গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি, পাইনি আমার জাগার সাথী,
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।।"

—এই রকম একটি ভাবগভীর স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় লেখা গীতিকবিতাকে — ভালবাসার গানকে — 'আধুনিক গান' বলতে পারলেন না। আজও ! অথচ গানটি — এরকম সহস্র গান — এমন একজন বিশ্বমানের কবির লেখা যিনি শুধু তাঁর কাব্যেই নয়, চিন্তায়, ভাবনায়, মননে, গ্রহণে, বর্জনে—জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রে তাঁর যুগে ছিলেন আধুনিকতার প্রতীক।

## আধুনিক গীতিকবিতার গুরুত্ব হ্রাস

রেকর্ড কোম্পানি-আকাশবাণী-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ইত্যাদির একক বা সম্মিলিত অবিমৃশ্যকারিতার জন্যই হোক বা অজ্ঞতা-জনিত কারণেই হোক, আধুনিক গানের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে এই গানকে ত্রাতা দেখানোর বা করে রাখার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আলোচনার ও বোঝার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির কথাই ধরা যাক। রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে কিন্তু 'রবীন্দ্রকবিতা' নামে আখ্যায়িত করার প্রয়োজনীয়তা দেখেনি কেউ। 'রবীন্দ্রকাব্য' কথাটা মূলত একটা বিশেষ যুগের কাব্যের মূল ধারাকে বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হয় ; আধুনিক কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আলাদা করার জন্য নয়। ফলে, নিজের যুগে তো বটেই, পরবর্তী কালেও একটা সময় জুড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আধুনিক কবিতা হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে। নোবেল পুরস্কার-জাত কৌলিন্য রক্ষার্থে 'আধুনিক' কথাটাকে খামখা ছোট করে দেখাবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। তাতে, বাংলা কবিতার সার্বিক যে লাভ হয়েছে গুণগত ও পরিমাণত ভাবে, তার হিসাবটা দেখলেই, রবীন্দ্র-যুগের ও তৎপরবর্তীতে বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণটা প্রকট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, 'কালি-কলম', 'কল্লোল' যুগের কবিদের সামনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আধুনিকতাকে অতিক্রম করার যে ইতিবাচক চ্যালেঞ্জটা ছিল, আধুনিক গীতিকবিদের সামনে সেরকম কিছু ছিল না। থাকবেটাই বা কী করে ? রবি ঠাকুরের গান তো হয়ে গেল 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'; আধুনিক গান তো আর হল না। আর রবীন্দ্রসঙ্গীত তো রবীন্দ্রসঙ্গীতই —এক ও অনন্য। স্বভাবতই, সেটাকে অতিক্রম করতে তো আরেকটা রবি ঠাকুরকেই জন্মাতে হবে ! ওদিকে, আর বাকি যাঁরা — তাঁদের গানও যাতে 'আধুনিক গান'-এর কুসংসর্গে পড়ে বখে না যায়, নামে-নামে লেবেল এঁটে আলাদা করে দেওয়া হল। এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, নজরুল — এঁদের লেখা ও সুর দেওয়া বিশাল গানের ভাণ্ডারকে নামে নামে লেবেল এঁটে উঁচু তাকে তুলে রেখে, বাকি যু বাঁচল — রাইচাঁদ বড়ালের সুরে কিছু গান, মীরা দেববর্মনের আর অজয় ভট্টাচার্যের কথায় শচীনদেবের গান, জ্ঞান গোঁসাই আর ভীষ্মদেবের অজস্র সিটকিরির মাঝে নাস্তানাবুদ কিছু কথার গীতরূপ, কানন দেবীর গাওয়া কিছু গান ইত্যাদি এবং আরও এই ধরনের কথা-অপ্রধান মূলত রাগাশ্রিত ও পাল্লীগীতি আশ্রিত কিছু গান দিয়ে গোড়াপত্তন হল একটি কিম্ভূতকিমাকার গানের ধারার যার নামকরণ করা হল — 'আধুনিক বাংলা গান'। ঘটনাটা হল, দুর্জির 'মাস্টারের' কাপড়ের মূল অংশটি একটি নির্দিষ্ট পরিধানের জন্য কাটা হয়ে যাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া, ফেলে দেওয়া বিভিন্ন ছিট কাপড়ের টুকরো জুড়ে জুড়ে রঙবেরঙের পরিকল্পনাবিহীন, চরিত্রহীন একটি জামা তৈরির সামিল। এবং মালটি চড়ানো হল বঙ্গসংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গে যার নাম সঙ্গীত।

এইভাবে দেখা যায় আধুনিক গানের ব্যাপারটা জন্মলগ্ন থেকেই এলোমেলো এবং গোলমেলে। ফলে, সত্যিকারের যোগ্য গুণী ব্যক্তিদের ভাল কাজের দৃষ্টান্ত ও চ্যালেঞ্জ সামনে না থাকায় আধুনিক বাংলা গানের ধারক-বাহকদের গানে 'আধুনিকতা' নিয়ে যেন কোনও দায়দায়িত্বই আর থাকল না। এবং এই আরোপিত বা স্বোপার্জিত দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় সেই সময়কার গানগুলি শুনলেই — অধিকাংশ গানের কথায় না পাওয়া যায় গীতিকবিতার কোনও নান্দনিক আবেদন, আবার আধুনিকতার (বিষয়গত) মূল উপাদানগুলিও — প্রাসঙ্গিকতা, যুগোপযোগিতা ও বাস্তবতা— সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

এই হল শুরু। কথার গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, গীতিকবিতার প্রয়োজনীয়তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই এইভাবে এক লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শুরু হল আধুনিক বাংলা গানের। সেদিন থেকেই এ-গান মূলত হয়ে দাঁড়াল শুধুমাত্র সুরের বাহন, কথা উপলক্ষ মাত্র। বাণী নিল

বিদায়, আর আমাদের সেই শুরু সুর গেলা। আর সেদিন থেকেই বাঙালি শ্রোতার কাছে গান হয়ে গেল মূলত ভাবের বিষয়, ভাবনার নয়। ভাবটাও আবার শুধু সুরের। ভাবলে, দুঃখ হয়, আবার নিজেদের বোকামিতে বেশ হাসিও পায়।

## রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী

অনবধানতা, অমনোযোগিতা, অন্যমনস্কতা, অজ্ঞতা — এর যে কোনও একটার বা সবগুলোর সম্মিলিত কারণে অতীতে বাংলা আধুনিক গানের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি দুর্ঘটনা ঘটল — (১) নিধুবাবুর টপ্পা, রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে নজরুলগীতি পর্যন্ত যাবতীয় ভাবগভীর, ভাবনাযুক্ত, জীবনের গভীর উপলব্ধি থেকে উঠে আসা অর্থবহ কথা দিয়ে গাঁথা বিভিন্ন ধরনের ও ধারার লঘু-গুরু গানকে আধুনিক গানের আওতার বাইরে রাখা, (২) ধনী সুরের প্রশ্রয়ে, দায়-দায়িত্বহীন মূর্খ কথার, তথাকথিত আধুনিক গানের মাথায় চড়ে বসা। কিন্তু, একটু চোখ-কান খোলা রাখলে, জাতি হিসাবে একটু কম আত্মবিস্মৃত হলে অতি সহজেই এই দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো যেত। বঙ্গসংস্কৃতি আপদে-বিপদে-সঙ্কটে সবসময় যে শুভ্রশ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত আলখাল্লা পরিহিত প্রাজ্ঞ আধুনিক ব্যক্তিটির স্মরণাপন্ন হয়েছে তিনি তাঁর গোঁফ-দাড়ি কাঁচা থাকা অবস্থাতেই আজ থেকে প্রায় একশ এগার বছর আগে, ১৮৮১ সালে (মাঘ ১২৮৮) 'সংগীত ও কবিতা' নামক সমালোচনাধর্মী নিবন্ধে এই বলে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন : "সংগীত ও কবিতা উভয়ে ভাবপ্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাবপ্রকাশ সম্বন্ধে যতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সংগীত ততখানি করে নাই। তার একটি কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোনো আকর্ষণ নাই — না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কানে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কানে মিষ্ট শুনায়। এইজন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সংগীতের ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এককালে যে দাস ছিল আর এককালে সেই প্রভু হইয়াছে। চক্রবৎ পরিবর্তনের দুঃখানিচ সুখানিচ — কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবেনা ? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের অনেক দুর্দশা, তেমনি সংগীতের ভূমি উর্বরা হওয়াতেই সংগীতের এমন দুর্দশা। মিষ্ট সুর শুনিবামাত্রই ভালো লাগে, সেই নিমিত্ত সংগীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই — কিন্তু শুধুমাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি।" এই ১৯৯৩-তেও আমার প্রশ্ন, একথা কি প্রযোজ্য নয় যে, আজও '... সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সংগীতের এমন অবনতি'?

## যোগ্য সঙ্গীত সমালোচকের অভাব

এবার মূল প্রসঙ্গের বিশদ ব্যাখ্যার খাতিরেই একটু প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। ১৯৫৫ সাল, ২৬ আগস্ট — সত্যজিৎ রায়ের জীবনের প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালি' মুক্তি পেল। মুক্তি পাবার প্রথম সপ্তাহে চারটি প্রেক্ষাগৃহে বসুশ্রী, বীণা, শ্রী এবং ছায়া — দর্শকসংখ্যা ছিল আঙুলে গোনা। দ্বিতীয় সপ্তাহে 'দেশ' পত্রিকায় ছবিটির সমালোচনা বেরোল। সমালোচক — শ্রী পঙ্কজভূষণ দত্ত। তারপরেই দর্শক ও চলচ্চিত্র সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন এবং দর্শকসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি। এ ঘটনার বহু পরে কিন্তু ছবিটি 'কান চলচ্চিত্র উৎসবে' 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট'এর মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিল। পঙ্কজবাবু তাঁর লেখাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন 'পৃথিবীরই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি'। সমালোচনার কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যাবে যে এই ব্যক্তিটির চলচ্চিত্রশিল্প সম্বন্ধে নান্দনিক উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টি কী পর্যায়ের ছিল। এবং সেইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসও। তিনি লিখলেন — " 'হয়তো', 'কিন্তু', 'যদি', 'বোধহয়', জুড়ে সঙ্কোচ বোধ করে বলা নয়, নির্দ্বিধায় স্পষ্ট করে একথা আজ পৃথিবীকে বলবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে যে, আমাদের দেশ পরিমাণেই শুধু নয়, গুণের দিক থেকেও এমন ছবি তৈরী করতে পারে, যা পৃথিবীর সমগ্র চিত্রশিল্পের ইতিহাসেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। একথা আজ সদর্পে বলতে পারা যাচ্ছে, 'পথের পাঁচালি' ছবিখানি দেখার পর।" "...এখন সত্যিই সারা পৃথিবীর টিকি নেড়ে একথা বলতে পারার আজ সুযোগ এসেছে যে, ভারতীয় ছবি সর্বাঙ্গীণ সৌকর্যে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পাবার মতো যোগ্যতর পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এবং বিস্মিত হতে হয় কীভাবে ছবিখানি তোলা হয়েছে সে কথা ভাবতে গেলে।" একটি মহৎ মৌলিক সৃষ্টির সঠিক সময়ে একটি অসূয়াবিযুক্ত আত্মবিশ্বাসে ভরা সাবলীল মূল্যায়ন সেই সৃষ্টিকে সাধারণ মানুষের কত কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে, সেটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার পক্ষে কতটা সাহায্য করতে পারে, পঙ্কজবাবুর উক্ত সমালোচনাটি প্রকাশিত হবার পর প্রেক্ষাগৃহে দর্শকসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে দর্শকসমাজে প্রচণ্ড আলোড়নের ঘটনা তার প্রমাণ।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে গানের ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের অনেক আগেই পঙ্কজবাবুর মতো একজন ব্যক্তির (ও ব্যক্তিত্বের) একান্তই প্রয়োজন ছিল যিনি ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুধরনের মন্তব্যের ক্ষেত্রেই, ইস্কাপনকে ইস্কাপন বলার প্রজ্ঞা ও সাহস রাখেন। বিশেষত আধুনিক গানের ক্ষেত্রে যেখানে, তথাকথিত আধুনিক গানের প্রাদুর্ভাবের প্রায় পঞ্চাশ বছর



আগে রবীন্দ্রনাথের মতো বিরল প্রতিভা সঙ্গীতের অবনতি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মতামত জানিয়ে একটি জাতিকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গীত সমালোচনার ক্ষেত্রে পঙ্কজবাবুর মতো যোগ্য, শিক্ষিত, আধুনিক ও আত্মবিশ্বাসী সঙ্গীত সমালোচক সে যুগে তো ছিলেনই না, আজও কজন আছেন সন্দেহ। যাঁরা ছিলেন বা আজও যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশেরই আধুনিক গান সম্বন্ধে লেখাগুলি মূলত অনুমানমূলক যা সঙ্গীত সমালোচনা জগতের দেউলিয়াপনাকেই তুলে ধরে। এটা আজ আর অস্বীকার করা যাবে না যে, ভাল সিনেমার, আধুনিক সিনেমার এক শ্রেণীর দর্শক এদেশে তৈরি হয়েছে। বাঙালি দর্শক সমেত। সংখ্যায় কম হলেও গুণগত মান বিচার করে ছবি দেখার ব্যাপারে দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের মেরুঅভিমুখীকরণ হয়েছে। কমিটেড দর্শকদের একটি গোষ্ঠী আজ বিদ্যমান যাঁরা কোনও অবস্থাতেই ঐ ধরনের নিকৃষ্টমানের ছবি দেখেন না। এইভাবে, চলচ্চিত্রের একটি মননশীল দর্শক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যাঁরা চলচ্চিত্রে শুধুমাত্র 'ইন্দ্রিয় সুখ'-ই নয় 'ভাবনার' খোরাকও খুঁজতে যান। এবং এই মনোযাগী দর্শকদের দেখে উৎসাহিত হয়ে এগিয়েও এসেছেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, শ্যাম বেনেগাল, গোবিন্দ নিহালনি, আদুর গোপালকৃষ্ণন, অপর্ণা সেন, কেতন মেহ্‌তা, গৌতম ঘোষ, রাজা মিত্রের মতো চিত্র পরিচালকেরা। শুধু চলচ্চিত্রই নয়, বস্তু থেকে ভাবনা এবং পাল্টা-পালায় ভাবনার বস্তুকে প্রভাবিত করার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শিল্পের অন্যান্য শাখাগুলিও — সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা — ভাঙা গড়ার মধ্যে দিয়ে ক্রমবিকশিত হয়ে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে উঠেছে। এবং পাঠক ও দর্শকদেরও যে একটি বিরাট ভূমিকা আছে এতে, তা আজ, আজকের গল্প, উপন্যাস, কবিতার ভাব ও ভাষা, নাটকের বিষয়বস্তু, সংলাপ, মঞ্চ ও আলোকসজ্জা, অভিনয়ের ধারা, চিত্রকলায় রঙের অভিনব ব্যবহার ও বিষয়বস্তুর বিমূর্তন — এসব একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। চিত্রকলার ক্ষেত্রে এখনও মননশীল বোদ্ধা দর্শকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, সাহিত্য ও নাটকের আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বাঙালি পাঠক ও দর্শককুলের একটি স্থায়ী অংশ সর্বদা প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, গ্রহণ বর্জন করার ক্ষমতাও তাঁরা আজ অর্জন করেছেন অনেকাংশে। তাঁরা সত্যিকারের 'আধুনিকতা' এবং 'আধুনিকতার ভান'-এর পৃথকীকরণেও সক্ষম। এ ব্যাপারে সমালোচকদেরও একটি অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা রয়েছে। এইভাবে দেখা যয়, সাহিত্য নাটক ও চিত্রকলা — শিল্পের এই তিনটি শাখার যুগে যুগে আধুনিক থেকে আধুনিকতর হয়ে ওঠার ব্যাপারে শিল্পী-সমালোচক এবং পাঠক-দর্শকের পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকা বরাবর থেকেছে। আজ তো আছেই। এসবের ফলে, বিশেষত সাহিত্য ও নাটকের পাঠক ও শ্রোতাদর্শকদের একটি বেশ ভাল অংশ সর্বদা খোঁজে থাকেন কোথায় নতুন ভাল কী বেরোল। একে ওকে, বন্ধু-আত্মীয় - পরিচিতকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন — 'নতুন কী পড়লে ?' বা 'অমুক নাটকটা দেখেছেন কিনা ?' — এবং সেখানেই শেষ নয়, দুজনেরই পড়া বা দেখা থাকলে সেটা নিয়ে বেশ আলোচনাও হয় তাদের মধ্যে। উপলব্ধির বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার ভাষাগত ও যুক্তিগত মান ভালো মন্দ যাই হোক্-না-কেন, বক্তার যে নিজস্ব মননের, চিন্তা-ভাবনা করার ন্যূনতম ধীশক্তি বা মনোবৃত্তির জায়গা তৈরি হয়েছে তাঁর মস্তিষ্কে ও মনে, বক্তব্যে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, অদ্ভুত ব্যাপার, একমাত্র এই গানের ক্ষেত্রে কেন জানি না, অধিকাংশ শ্রোতার মতামতে ঐ ধী ও মনোবৃত্তিগত প্রয়োগের অভাব দেখা যায়। আজও তাই অধিকাংশ বাঙালি শ্রোতার কাছে গান — তা রাগাশ্রয়ী, শ্যামাসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, আধুনিক যাই হোক না কেন — সুরে ডুবে যাবার মাধ্যম হিসাবেই রয়ে গেছে। আবারও মনে করিয়ে দিই, একশ এগার বছর আগের সেই সতর্কবাণী থাকা সত্বেও এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো দৃষ্টান্তমূলক জাতীয় শিল্পসম্পদ বাঙালি শিল্পী সুরকার গীতিকার শ্রোতা সমালোচক সকলের সামনে থাকা সত্ত্বেও সঙ্গীত, বিশেষত আধুনিক গান, আমাদের সকলের কাছে 'ইন্দ্রিয়সুখ'-এর আবেশে আবিষ্ট হয়ে সুরে ডুবে যাওয়ার একটি মাধ্যমের বেশি কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। '..... সংগীতের ভাবের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই ।'

## তথাকথিত আধুনিক গানের বিষয় একটিই — প্রেম

এবার আমি বহুলপ্রচলিত কয়েকটি জনপ্রিয় বাংলা আধুনিক গানের উল্লেখ করছি : ১। না যেওনা, রজনী এখনো বাকি, ২। বনতল ফুলে ফুলে ঢাকা, ৩। এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি, ৪। আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি, ৫। প্রেম একবারই এসেছিলো নীরবে, ৬। পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী। জনপ্রিয় এই গানগুলির সুরকার ও শিল্পীরা এতই স্বনামধন্য যে তাঁদের নাম উল্লেখ ধৃষ্টতামাত্র। গানগুলি এখনও প্রায় নিয়মিত শোনা যায়। মুখে-মুখেও ফেরে। আরও অনেকদিন ফিরবে, বিশেষত আজকাল ভাল সুর ও কণ্ঠের যা আকাল ! সত্যি কথা বলতে কি এই গানগুলো আমাদের (বিশেষত যারা চল্লিশোর্ধ্ব) জীবনের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে যে, হেমন্ত-মানবেত-শ্যামল যে আমাদের মধ্যে আর নেই সে কথাটা কাগজে ওঁদের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে চোখ পড়লে মনে পড়ে। তখন মনটাও খারাপ হয়ে যায়। এঁদের মতন বা যাঁরা এখনও জীবিত আছেন — লতা, মান্না, সন্ধ্যা — এরকম সোনাঝরা কণ্ঠের শিল্পী শতাব্দিতে

দু-একজনের বেশি আসেন না। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, স্বরাট — কি কণ্ঠস্বরে, কি গায়নভঙ্গিমায়। গানগুলির সুরও অনন্য। সুরের চলনগত, ছন্দোগত, লয়গত, ধারাগত স্বাতন্ত্র্যে, গায়কীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে, প্রত্যেকটি গান নিজের নিজের জায়গা করে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ শ্রোতার হৃদয়ে। কিন্তু ভাব ? পাঠকরা ক্ষমা করবেন, কিন্তু, কষ্ট হলেও বলতে আজ বাধ্য হচ্ছি — ভাব বলুন, বিষয় বলুন, একটিই — প্রেম ; তাও আবার একেবারেই 'তুমি আর আমি'র। না আছে কোনও জেনারালাইজেশন্, না বিমূর্তন। এবং ভাবের এই দুর্বলতা, স্বভাবতই, ভাষাতেও প্রকাশ পেয়েছে। এমনকি উচ্চারণেও আধুনিকতা কোথাও উচ্চকিত — ফলে 'মন না দিয়ে আর পারিনি'তে 'মন' হয়ে গেছে 'মোনো'। অথচ, এসব গানের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের একটি সাধারণ 'তুমি-আমি' নিয়ে গানও — 'তোমার হলো শুরু, আর আমার হলো সারা' — কত বেশি ব্যঞ্জনাময়। নন্দনতত্ত্বের শর্ত বজায় রেখে প্রেম বিষয়ক গীতিকবিতা যে কত গভীর দ্যোতনাময় ও একই সঙ্গে কত আধুনিক হতে পারে তার দুটি দৃষ্টান্ত (একটি আংশিক) এখানে দিচ্ছি। আর একটি — 'আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে' — আগেই উল্লেখ করেছি।

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায় —
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।।

সেকথা শুনিবেনা কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি
আকাশে জল ঝরে অনিবার —
জগতে কেহ যেন নাহি আর।।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণবরিষণ একদা গৃহকোণে —
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার।।

এবং

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে —
তবে তো ফুল বিকাশে ।।
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে।।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে।।
ফিরে এসো, ফিরে এসো — বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে।।

কোনও মন্তব্য বা তুলনামূলক ব্যাখ্যা আশাকরি নিষ্প্রয়োজন। আরও কয়েকটি গান প্রেম পর্যায়ের — 'সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপনসনে / কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না', 'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ তেমনি করে গাও গো/ আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো,' 'হে নিরুপমা, / গানে যদি লাগে বিহ্বল তান, করিয়ো ক্ষমা,' 'পুরানো জানিয়া চেয়োনা আমায় আধেক আঁখির কোণে / অলস অন্যমনে', 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না / যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না / ...... যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে/ আমি চমকি চলে যাব আন কাজে', 'মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে / ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে?' — একেবারেই ভাবা যায়না যে, যে-ভাষায় এই সমস্ত আধুনিক গীতিকবিতা লেখা হয়েছে সেই ভাষায় কোনও আধুনিক গানের গীতিকার, কয়েক দশক পর বা অর্ধশতাব্দীর পর কোন্ বোধ থেকে লিখতে পারেন 'শ্যাম তুমি হেরে গেলে' বা 'পল্লবিনী গো সঞ্চারিনী'র মতো গান ?

## ভাবের প্রতি মনোযোগের অভাব

রবীন্দ্রনাথের দুটি কথা এখনও খুব প্রাসঙ্গিক — 'ইন্দ্রিয়সুখ' আর '... সংগীতের ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই'। এবং আজও 'মনোযাগ অধিকাংশের তরফ থেকে দেওয়া হয়না বলিয়া' ও 'ইন্দ্রিয়সুখ' ব্যতীত আধুনিক গানের কাছে অন্যতর দাবী মূলত না থাকায় সাধারণ শ্রোতার কাছে গান সম্বন্ধে সাধারণত দুটি মন্তব্য শোনা যায় ; হয়, 'বাঃ সুরটা দারুণ !', বা 'দুর বাজে সুর একেবারে।' অথচ একই লোক চলচ্চিত্র, নাটক, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই, মতামত দেবার ব্যাপারে মননের পরিচয় রাখেন। মনন — সে যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ, ওগুলো নিয়ে কম-বেশী ভাবেন, ভাববার চেষ্টা করেন। একটা কোথায় যেন নিজের মতো করে বোঝার, ভাবার, ভেবেচিন্তে মতামত দেবার উদ্যোগ থাকে। একজন অসংস্কৃত দর্শকও 'অমুকের পার্টটা ভাল লেগেছে' — অন্তত এটুকু মতামতও দেন নাটকটা ভাল লেগেছে কেন বলতে গিয়ে। সাহিত্যের বিষয়ে মতামত দেবার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগটা পাঠকের মধ্যে দেখা যায়। ভাল-মন্দ, পছন্দ-অপছন্দের নির্ণায়ক ব্যক্তিমানুষের রুচি, সংস্কৃতি — পারিবারিক ও অর্জিত, শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া প্রত্যেকের কিছু নিজস্বতাও আছে। কিন্তু একটা শিল্পকর্ম তার ভালো লাগুক বা মন্দ লাগুক, রুচি-শিক্ষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে মধ্যবিত্ত বাঙালি ঐ 'বাঃ দারুণ' বা 'দুর, বাজে' বলা থেকে বিরত থেকে ভাল বা খারাপ লাগার কারণটা নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি-ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে নিজের মতের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। এককথায় তিনি সমালোচনা করেন।



কিন্তু বিষয়টা গান হলেই যত সমস্যা। একজন শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন সংস্কৃতিবান শ্রোতারও সাধারণত 'যেমন সুর তেমনি গলা' (ভালো, খারাপ দুই অর্থেই) — এর বাইরে আর কিছু খুব একটা বলার থাকে না। কারণটা আর কিছু নয় — সাহিত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত একটি সমালোচনার ধারা তৈরি হয়েছে। বোঝার মতো এবং তার সাহায্যে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করার মতো একটা ভাষাও। তাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগের মাধ্যমে ব্যক্তিটি জেনেছেন, জানছেন কীভাবে, কী ভাষায় একটি চলচ্চিত্র, নাটক, গ', ইত্যাদির সমালোচনা করতে হয়। অবশ্যই এই জানাটা সকলের সমান নয়। হবার কথাও নয়। কিন্তু, সমালোচনা সাহিত্যের শিল্পগত মান ও সীমারেখা নিয়ে বিতর্ক বা প্রশ্ন থাকলেও এটা তো ঘটনা যে একটি বোধগম্য ধারা হিসাবে এটি বিকাশমান। এবং মোটামুটি সাধারণের পক্ষে হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব এমন একটি ভাষার উপস্থিতিও আছে। কিন্তু সঙ্গীত সমালোচনার সাধারণবোধ্য কোনও ভাষা নেই। থাকার সেরকম কোনও কারণও নেই। কারণ, যে-গান সাধারণ লোক সবচেয়ে বেশি শোনে সেই আধুনিক গান নিয়ে সঙ্গীত সমালোচনার কোনও ধারাই তৈরি হয়নি। আধুনিক গানের কথায় যেহেতু ভাবনার খোরাক থাকেই না বললে চলে তাই সমালোচকের কাছেও এতদিন গান বস্তুটি চোখ বুজে শোনার প্রক্রিয়া বই কিছু ছিল না। ফলে, যা দু-চার কথা লেখার তা সুর নিয়েই। ফলশ্রুতি — এক অনুমানমূলক সমালোচনা — যা বায়বীয়, এবং আমার আপনার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। যাই হোক, বিশেষজ্ঞ সমালোচকদের অবিমৃশ্যকারিতার ফলেই হোক, নিজের সঙ্গীতবোধকে শিক্ষিত করে তোলার চেতনার অভাব বোধ থেকেই হোক আর ভাগ্যের দোষেই হোক, কয়েকটি জাতিগত মুদ্রাদোষে মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রোতারা আজ আক্রান্ত। সেসবের অন্যতমটি হল, গান — সুরেলা কণ্ঠে ভাল গান, শোনার সময় দুচোখ বুজে ফেলা। গান — সে 'আছে মৃত্যু আছে দুঃখ,' 'আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী,' বা 'রানার' — যাই হোক না কেন। ব্যাপারটি সংক্রামকও। অর্থাৎ, কান খুলে, চোখ বুজে, বোধ ঢেকে, সুর-সলিলে ডুব দে মা আহা বলে !!

## অন্যমনস্কতা এবং বোধিক জড়তা

রবীন্দ্রনাথ যেটাকে অমনোযোগিতা বলেছেন সেটা থেকেই এসেছে এক অন্যমনস্কতা। এবং এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই অন্যমনস্কতা জন্ম দিয়েছে এক বোধিক জড়তার। তা না হলে রাম বাবু, যিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'চিতা কাঠ ডাকে আয় আয়' পড়ে বা শম্ভু মিত্রের 'দশচক্র' দেখে রিয়্যাক্ট করেন রীতিমত, তিনি 'বেদের মেয়ে জোস্না' বা 'লালকুঠি'র গান শুনে কিংবা কুমার শানুর কিশোরের চেয়েও অশুদ্ধ উচ্চারণে গাওয়া আধুনিক গানে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ফিরে যেতেন না 'মধুমালতি ডাকে আয়'-এর সুরে। তিনি খুঁজতেন। খুঁজলে যে কিছু ভাবনার খোরাক দিতে পারে এমন গান পেতেন না তাও নয়। বা, না পেলে, ক্ষুব্ধ হতেন, রেগে যেতেন। হারানো দিনের গানে ফিরে না গিয়ে এই কথাটা অন্তত একবার ভাববার চেষ্টা করতে পারতেন : 'আচ্ছা, রাজনীতি, ব্যর্থ বিপ্লব, শিশু শ্রমিক, হিজড়ে, বেকারত্ব, ঘাসহীন পার্ক, দুর্নীতি, রাগ, ঘেন্না, বিরক্তি, ভালবাসা, শ্রমিক, নগ্ন নারী, ভূমিহীন চাষি, বেশ্যা, ইডিপাস কমপ্লেক্স, বন্ধুত্ব, বিবর, ধীবর, বানতলা, রতিক্রিয়া, পাগল, প্রসূতিগৃহ, শ্মশান, ঘোড়া, আমলাতন্ত্র, ড্রাগ ইত্যাদি — জগতের জীবনের যাবতীয় অনুষঙ্গ যদি পদ্য, গদ্য, নাটক, চলচ্চিত্র, চিত্রকলার বিষয়বস্তু হতে পারে, এবং যোগ্য প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিক দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে পাঠক-দর্শকের মধ্যে কমিউনিকেটেড্ও হতে পারে, তাহলে, প্রেম-ভালবাসা-প্রকৃতি আর ঈশ্বর ছাড়া গান কেন আর কোনও বিষয়বস্তু খুঁজে পাবে না ?' কিন্তু সত্যিই দুর্ভাগ্যের বিষয়, গড় শিক্ষিত ব্যক্তি আজও খোঁজেন না। গল্প-কবিতা-নাটক-ছবি ইত্যাদির মতো গানেরও একটা ভূমিকা আছে মানুষকে ভাবাবার ক্ষেত্রে, সে ভাবনা তো দূরে, প্রেমের গানেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের পায়ের নখের যুগ্যিও একটি গীতিকবিতার চাহিদায় আমাদের রাম বাবু বা শান্তনুরা উন্মুখ হয়ে ওঠেন না। তাই, প্রায় ত্রিশ বছর আগে প্রণব রায়ের লেখা 'এ জীবনে যত ব্যথা পেয়েছি' বা 'আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি' আধুনিক বাংলা গানে গীতিকবিতার হাইট !

## প্রবীর মজুমদার

গীতিকবিতার বা গানের কথার প্রশ্নে সাধারণ ছবিটা মোটামুটি একরকমই। তবে, সবকিছুরই যেমন ব্যতিক্রম থাকে, এক্ষেত্রেও আছে। কেউ কেউ আবার এতদিনে 'ছিলেন' হয়ে গেছেন ; যেমন, প্রবীর মজুমদার। সুরকার নয়। আমি একজন গীতিকার হিসাবে তাঁর ব্যতিক্রমী ভূমিকার কথা বলছি। প্রবীর বাবুর লেখা (ও সুরে) ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গাওয়া, 'মাটিতে জনম নিলাম, মাটি তাই রক্তে মিশেছে' — এই গানটি শুধুমাত্র একটি গান নয়। এটি একটি অনন্য সাঙ্গীতিক সৃষ্টি। তথাকথিত অতি জনপ্রিয় সব বাংলা গান শুনতে শুনতে এই গানটি প্রথমবার হঠাৎ শোনা এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। মাথা দোলানো বন্ধ করে বেবাক হয়ে যেতে হয়। কারণ এই গানটিতে সুরের প্রশ্রয়ে শূন্যগর্ভ কথার মাথায় চড়ে ওঠার বদলে সুরই যেন কথার গুরুত্ব বুঝে তাকে অনুসরণ করছে। সুর যেন আকৃষ্ট হচ্ছে কথার ভরকেন্দ্রের দিকে। সুর কথার সুশাসনে, নিজেকে নয়, কথার দ্যোতনাকেই প্রকাশ করছে, মহিমান্বিত করছে কথার গৌরবকে। সুরকে আমি খাটো করছি না। কারণ, শেষবিচারে,

গানে সুরই কথাকে প্রকাশ করে। কিন্তু, আমাকে তুমি কিভাবে প্রকাশ করবে তার শর্তাবলি কথাই এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। ধনঞ্জয়ের কণ্ঠ এখানে যেন শুধু একটি গান পরিবেশন করছে না, মাটির—দেশের মাটির— মন্ত্র উচ্চারণ করছে শ্রোতার হৃদয়কে শিহরিত করে। এছাড়াও প্রবীর বাবুর লেখা প্রচলিত বিষয়বস্তুর বাইরে, গতানুগতিকতামুক্ত, বেশ কিছু গান আছে যেগুলি জনপ্রিয়, সকলেরই মোটামুটি জানা। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও সুরে দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া 'এমন একটা ঝড় উঠুক, কোনোদিন যেনো কোন ফুল আর ফুটতে পারে না' গানটিও নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী গান। অত্যন্ত আধুনিক একটি সঞ্চারি—'তবু দুনিয়াটা কিছু পাল্টানো গেলে পরে / হয়তো বা কিছু হয় / ভালবাসা মনে নাও হতে পারে, বেহিসেবি পরিচয়'; ভাষাও যথার্থে আধুনিক। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিপখান তিন দাঁড়' কবিতাটি সুর করেও অভিজিৎ বাবু আধুনিক গানের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে, ধারাবাহিকতার অভাব আছে। প্রণব রায়ের নামও এ প্রসঙ্গে আসে। মূলত কবি ছিলেন বলে তাঁর লেখা গানগুলিতে বিষয়বস্তু বা ভাবের স্বাতন্ত্র্য না থাক, ভাষা গীতিকবিতার শিল্পগুণে বেশ স্বতন্ত্র—বিশেষ করে সমসাময়িক বা কিছু পরের দুই ফরমাইসি গান লেখকের তুলনায়, যাঁদের লেখা বাংলা আধুনিক গান বোধহয় সংখ্যায় সর্বাধিক। সব মিলিয়ে বিচার করলে, যে তিনজন গীতিকারের নাম করলাম তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রবীর মজুমদারের মাথাতেই প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর বাদ দিয়ে ভিন্ন বিষয় নিয়ে, অন্যতর ভাবনা নিয়ে গান লেখার ব্যাপারটা শেষদিন অবধি ছিল। আধুনিক গান নিয়ে নির্দিষ্ট ভাবনাচিন্তা ছিল নিরন্তর। ছিল একটা উদ্দেশ্য। গান লেখা ও সুর করার আগে উনি ভাল করে জানতেন উনি কী করতে যাচ্ছেন। এবং এ পরিচয় ওঁর তৈরি গানগুলি শুনলেই পাওয়া যায়।

## সলিল চৌধুরী

অবশ্য প্রথম বড় ব্যতিক্রম — রবীন্দ্রনাথের পর — শ্রদ্ধেয় সলিল চৌধুরী। সুরকার হিসেবে নতুন করে বলার কিছু নেই— par excellence ! হ্যাঁ, একটা খুব জরুরি কথা বলার আছে। সলিল বাবু সুরকারের বেশি কিছু ছিলেন। ইংরেজিতে যে অর্থে 'কম্পোজার' কথাটি ব্যবহৃত হয় তার অন্তর্নিহিত অর্থ বাংলায় 'সুরস্রষ্টা' শব্দটিতেই সঠিক প্রকাশ পায়। আমার মনে হয়, 'কম্পোজার' বা 'সুরস্রষ্টা' 'তাঁকেই বলা যায় যাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি, যা আসলে একটি নতুন ধারা, ঐতিহ্য-ঋণী হয়েও স্রষ্টার প্রজ্ঞা, উপলব্ধি ও প্রতিভার প্রয়োগে প্রচলিত ধারা থেকে ভিন্ন — ভাবে, ভাষায়, সুরে, উচ্চারণে, স্বর প্রক্ষেপে, উপস্থাপনায়। দেশীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য থেকে মৌলিক উপাদানগুলি বেছে নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে যিনি নিঃসংকোচে সংশ্লেষ ঘটাতে পারেন বিদেশি সঙ্গীতের যেকোনও ধারার উপাদান তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির স্বার্থে। স্রষ্টার নিজস্ব মনন এবং উপলব্ধির তত্ত্বকরণ তাঁকে একটি বিশেষ দিক নির্দেশ করে, যেখানে, সঙ্গীতের একটি নতুন ধারা আবিষ্কৃত হবার অপেক্ষায় উন্মুখ। এবার তিনি তাঁর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রিত তাপে আয়ত্তাধীন দেশি-বিদেশি সাঙ্গীতিক উপাদানগুলির রাসায়নিক সংশ্লেষ ঘটান। জন্ম নেয় সেই বহু কাঙ্খিত নবা ধারাটি যার চারিত্রিক গঠন, বিজ্ঞানের ভাষায়, যান্ত্রিক মিশ্রণের নয়, হয় রাসায়নিক যৌগের ; যার মধ্যে বিক্রিয়াকারী মৌলিক উপাদানগুলির অস্তিত্ব বা চারিত্রিক গুণ থাকে না, যদিও, তাপ-রাসায়নিক বিশ্লেষণে সেই মৌলগুলির আণবিক গঠন ধরা পড়ে। তাপের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের দুটি অণু ও অক্সিজেনের একটি অণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে জলের একটি অণু যেভাবে তৈরি হয়।

এইভাবে, সঙ্গীতের ইতিহাসে যুক্ত হয় একটি নতুন সাঙ্গীতিক ধারা যা ঐতিহ্যবিযুক্ত না হয়েও, ঐতিহ্যের পৌনঃপুনিকতা ও 'ক্লিশে' ধারাগুলিকে অস্বীকার করে যথার্থেই আধুনিক। এবং সঙ্গীতেতিহাস, এই সন্ধিক্ষণে, যে বাঁকটি নেয় তার কৌণিক গতি নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট হয় মূলত এই বিশেষ ব্যক্তিপ্রতিভার শিল্পমনস্তাত্ত্বিক অভিপ্রায়, তাঁর তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক অন্বেষা ও ক্ষমতার দ্বারা। এই অন্বেষার মধ্য দিয়েই তিনি আত্মস্থ করেন Zeitgeist — তার যুগধর্মের অন্তরাত্মাকে। তাঁকে মুখোমুখি হতে হয় এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের — এই জাইটগাইস্ট-কে কথা আর সুরে ধরে তার সাঙ্গীতিক প্রতিফলন ঘটানোর এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। গানে কথা আর সুরের প্রশ্ন আছে। কিন্তু যেখানে সুরই মাধ্যম সেখানে শিল্পীকে আবিষ্কার করতে হয় সুরের এমন এক জটিল ধারা যাকে একাধারে বিষয় ও আঙ্গিকের ভূমিকা পালন করতে হয়। সৃষ্টি হয় সঙ্গীতের এক নতুন ধারা, আর সেই স্রষ্টাশিল্পীকে বলা হয় 'কম্পোজার' যার চির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বেঠোফেন, মোৎজার্ট, বাখ, চাইকোভ্স্কি, শোপাঁ প্রমুখ। এঁরা এক একটি নতুন সুর শুধু নয়, সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছেন। তাই, 'কম্পোজার' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ (অবশ্যই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে) 'সুরকার' তো নয়ই (আগেই বলেছি), এমনকি 'সুরস্রষ্টা'ও বোধহয় যথার্থ নয় — 'সঙ্গীতস্রষ্টা' শব্দটিই বোধহয় কাঙ্খিত অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনাটি প্রকাশ করে। আধুনিক গানের ক্ষেত্রে, 'কম্পোজার' বা 'সঙ্গীতস্রষ্টা'কে তাঁর যুগের জটিল সমস্ত বিষয়গুলিকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য তৈরি করতে হয় শ্রোতার বোধগম্য প্রাঞ্জল এক নতুন আধুনিক ভাষা ও সুপ্রযুক্ত সুর। আর, এইভাবেই এক জটিলতর রসায়নের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় সঙ্গীতের একটি নব্য ধারা — বাস্তব, প্রাসঙ্গিক, যুগোপযোগী আধুনিক গান। সেই গানকে যুগের হয়েও হয়ে উঠতে হয় যুগোত্তীর্ণ, এবং এখানেই ওত



পেতে থাকে অদৃশ্য সেই কঠিনতম চ্যালেঞ্জটা — সাধারণীকরণ (Generalisation) ও বিমূর্তন (abstraction)-এর রহস্যোদ্ঘাটনের চ্যালেঞ্জটি। আত্মবিশ্বাস, ঝুঁকি নেবার সাহস আর প্রতিভার ওপর ভর করে এই শেষ বাধাটিও অতিক্রম করেন তিনি ; 'সঙ্গীতস্রষ্টা' আবহমান সঙ্গীতের ইতিহাসে সংযোজন করেন নবতম চিরস্থায়ী সাঙ্গীতিক ধারাটি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

---

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যার বিশেষ প্রবন্ধ

**ধর্ম ও রাজনীতি**

**লিখেছেন অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

# গ্রন্থ সমালোচনা

## সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্রিধারার প্রথম স্রোত সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাস ইতিপূর্বে বহু ঐতিহাসিক রচনা করলেও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সময়ও এ যাবত আসেনি। তাই আপাতত আমাদের খণ্ড ইতিহাসে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কালীচরণ ঘোষ, ডঃ রমেশ মজুমদার ও অরুণচন্দ্র গুহ প্রমুখদের পথপ্রদর্শক গবেষণামূলক কর্ম এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবী নায়কদের আত্মস্মৃতি যার উল্লেখ লেখক করেছেন (বীণা দাসের 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার', কমলা দাশগুপ্তের 'রক্তের অক্ষরে', অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'বকসা ক্যাম্প', শান্তিসুধা ঘোষের 'উনিশ ত্রিশ'-এর মত আত্মস্মৃতি অথবা ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের বিশিষ্ট গ্রন্থ 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' এবং ঐ জাতীয় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ সমালোচ্য গ্রন্থে না থাকা এর একটা অপূর্ণতা বলে মনে হয়) এবং সরকারী মহাফেজখানার মূল কাগজপত্র এই বিষয়ের গবেষক ও লেখকদের কাছে সহজপ্রাপ্য। এই সব উপাদান থেকে ভারতের অগ্নিযুগ — লেখক সঙ্গত কারণেই যার নামকরণ করেছেন The Revolutionary Nationalist Movement — তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

লেখক প্রবীণ অধ্যাপক শান্তিময় রায় পশ্চিমবঙ্গের জন-জীবনে একটি শ্রদ্ধাভাজন নাম। কেবল ইতিহাসের অধ্যাপক বা ঐ অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবেই নয়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সক্রিয় কর্মীদের প্রথম সারির আদর্শবাদী নেতা হিসাবে প্রয়োজন পড়া মাত্র তাঁকে রাজ্যের জনজীবনে বার বার অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। এমন একজন লেখকের কাছ থেকে পাঠকের আশা অনেক। তাই সঙ্গত কারণেই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায় গ্রন্থের প্রশস্তি করার সঙ্গে সঙ্গে এই খেদোক্তিও করেছেন যে, স্বয়ং আরোপিত নিয়ন্ত্রণের জন্য "তিনি আমাদের যতটা দিতে পারতেন তা দেননি।" এর একটা প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর গবেষণাকার্যের পরিণাম এ গ্রন্থ নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থের জন্য লিখিত চারটি রচনা এই গ্রন্থভুক্ত (সম্পাদনার প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি দিলে এর কারণে যে পুনরুক্তি দোষ স্থলে স্থলে ঘটেছে, তা এড়ানো যেত) করা হয়েছে। কিন্তু কী পাইনি তার হিসাব মেলাতে না বসে যা পেয়েছি তার জন্য শ্রদ্ধাভাজন লেখককে প্রশংসা জানাই ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়ের সুরে সুর মিলিয়ে : "তিনি যে কার্যের সূত্রপাত করলেন, আশা করব, তাকে পরবর্তী কালের লেখকরা এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং এর পরিণামে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে যুক্তিযুক্তভাবে বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনেরও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হবে। যত দিন তা সম্ভব না হচ্ছে তত দিন তাঁর বেছে নেওয়া এই ক্ষেত্রের ইতিহাস হিসাবে অধ্যাপক রায়ের এই কৃতি পথপ্রদর্শক রচনা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।"

প্রথম ছয়টি অধ্যায় বা প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এই শতাব্দীর গোড়া থেকে দুই ভাগে (১৯১৮ খ্রি ও ১৯৪৭ খ্রি) জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বর্ণনা ও তার মূল্যায়ন। ইতিহাস রচনার সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ পন্থার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লেখক যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তার উল্লেখ করা হবে। ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম যুগে ঐ সব দলের বিস্তৃতি ও কিছুটা সংহতি এবং "ডাকাতি ও সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও স্বদলভুক্ত কর্মীদের হত্যা করার" ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও "গুণগত ভাবে" আন্দোলন বিকশিত হয়নি। জেলে নরেন গোস্বামী, মহারাষ্ট্রে জ্যাকসন প্রমুখের হত্যা এবং দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যার প্রয়াস সত্ত্বেও ঐসব ঘটনার অধিকাংশই এদেশে "ইটালি বা আয়ারল্যান্ডের মতো উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদের পক্ষে সক্রিয় আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি।" পরবর্তীকালে যে বহুলসংখ্যক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়, গুপ্তচর বিভাগের প্রতিবেদন এবং ঐসব ঘটনার নায়কদের স্বয়ং জেলের সহযোগীদের কাছে স্বীকারোক্তি অনুসারে "এমন একটা সময়ে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সমস্যার সৃষ্টি করে যখন ১৯১৫ খ্রি. আসন্ন বৃহত্তর বিপ্লবী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। অনুশীলন বা যুগান্তর কোন দলই মোটামুটি সমান্তরালভাবে প্রয়াস চালিয়ে ১৯১৫ খ্রি. যে বিরাট ঘটনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল উপযুক্ত সময়ে তাতে সাড়া দিতে পারেনি।" অনুরূপভাবে ১৬১ পৃষ্ঠায় লেখক এই আন্দোলনের আরও কয়েকটি মৌলিক দুর্বলতার — নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ভবিষ্যৎ সমাজের চিত্র তুলে ধরার ব্যর্থতার কারণে গণচেতনা জাগরণে ব্যর্থতা, এর বিদেশি নেতৃত্বের সন্দেহজনক স্বদেশপ্রেম, অর্থ ও কর্তৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্বের সংকীর্ণ মানসিকতা ইত্যাদি উল্লেখ করার সৎসাহস দেখিয়েছেন। লেখক স্বয়ং একদা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হলেও উপযুক্ত ইতিহাস-চেতনার কারণে পথভ্রান্ত যৌবনের ঐ মহৎ অভিব্যক্তির সম্যক মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়" অথবা গোপীনাথ সাহা প্রসঙ্গে



গান্ধীজির বক্তব্যে একই মানসিকতার (আপাত সম্বর্ধিত উত্তেজক কিন্তু ভ্রান্ত পদক্ষেপ বনাম করতালির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আদ্যান্ত হিতকর ক্ষুরস্য ধারা নিশিতো দুরত্যয়া পন্থার বিবাদ) প্রকাশ পেয়েছে।

অধ্যাপক রায় আদ্যান্ত অসাম্প্রদায়িক বলে, অগ্নিযুগের অপর একটি দুর্বলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি স্বীকার করেছেন, "জাতীয় বিপ্লবীরা মুসলমান বিরোধী ছিলেন এই অভিযোগ একটা সীমিত কালে কিয়ৎ মাত্রায় সত্য" (পৃ ৭৯)। একদা জাতীয় বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও ভাই পরমানন্দের মত নেতারাই নন, অগ্নিযুগের আরও অনেক কর্মীদের পরবর্তী কালে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শিবিরভুক্ত হওয়া এই সত্যের দ্যোতক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লেখক যাদের ওহাবী-রোহিলা আন্দোলনের উত্তরসাধক (জামালউদ্দিন আল্ আফগানি ও দেওবন্ধ প্রভাবিত উলেমা গোষ্ঠী — পৃ ৯) রূপে অগ্নিযুগের মুসলিম পুরোধার স্থান দিয়েছেন, কালক্রমে কেবল খিলাফতি-মোপালা বিদ্রোহী রূপেই নয় তারপরও তাঁরা কেমন ভাবে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের শিবিরকে শক্তিশালী করেছেন, তার উল্লেখ কোথাও না করায় আরও অনেক অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী ও লেখকের বিরুদ্ধে যে একদেশদর্শিতার অভিযোগ ওঠে শ্রদ্ধাভাজন লেখকের বিরুদ্ধেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা আছে আশঙ্কা হয়।

দ্য আর্মি ইন ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল শীর্ষক অধ্যায়টি গ্রন্থের একটি অভিনব অঙ্গ। গ্রন্থকার যথার্থই বলেছেন যে "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার উপর যথোচিত আলোকপাত করা হয়নি" (পৃ ১৪৪)। তবে এই বাঞ্ছনীয় কার্যের শুরুতেই ওহাবী আন্দোলনকে "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখবন্ধ" আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়। ওহাবী আন্দোলনে তদানীন্তন শাসকশক্তি ভারতের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংঘাতের উপাদান থাকলেও (আর এটাও প্রকট হয় শিখ শক্তির পরাজয়ের পর এবং প্রথম দিকে ভারত সরকার শিখ বা সাধারণ শত্রু বিরোধী বলে ওহাবীদের বরং প্রশ্রয়ই দিত) মূলত এ হল শরিয়তি ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলন। তাঁদের দার-উল-হারব, দার-উল-ইসলাম, জেহাদ এবং শেষ অবধি আফগানিস্তানে অতীব দুঃখজনক পরিণতির ব্যর্থ হিজরৎ ইত্যাদি আদর্শ ও কর্মসূচি এই সত্যের দ্যোতক। "জনসাধারণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (crusade) আরম্ভ করতে ও এক ধর্মীয় (divine) রাজত্ব স্থাপন করতে আহ্বান জানিয়ে যেসব ওহাবী প্রচারপত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে বিলি হয়" ইত্যাদি লেখকের স্বীকৃতিও (পৃ ১৪৫) এই সত্যের দ্যোতক। যে দৃষ্টিভঙ্গির কারণে একদা জিন্নাকে মুসলিম গান্ধী, পাকিস্তানের দাবিকে মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং তাই স্বাধীনতার দাবির সমতুল্য রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল, ওহাবী বা ফরাজী আন্দোলনকে মুসলমানদের নেতৃত্বের স্বাধীনতা আন্দোলনরূপে চিত্রিত করার চেষ্টা সেই ভ্রান্ত দৃষ্টির জের এবং সদিচ্ছাপ্রণোদিত হলেও সত্যের পরিপন্থী বলে বর্জনীয়। •

পূর্বোক্ত মৌলিক ত্রুটি সত্ত্বেও এই অধ্যায়টি রচনার প্রয়াস প্রশংসনীয়। এর জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখকের প্রয়াসকে অন্যতম পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। তবে সমগ্র গ্রন্থটি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যা সত্য, স্বয়ং আরোপিত নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্ষেত্রে লেখক যতটা দিতে পারতেন তা দেননি। একে 'তো তাঁর পরিক্রমা তিনি কোন এক অজ্ঞাত কারণে ১৯১৮ খ্রি. শেষ করে দিয়েছেন। এর ফলে পরবর্তী কালে সেনাবাহিনীর বহু উল্লেখনীয় কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনকালীন গাড়োয়াল• রেজিমেন্টের সেই সব বীর স্বদেশপ্রেমী সৈনিকদের কাহিনী বাদ গেছে যাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে নিরস্ত্র খুদা-ই-খিদমতগার সত্যাগ্রহীদের উপর গুলি চালাবার আদেশ অগ্রাহ্য করে এবং তার জন্য শাস্তি বরণ করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। দ্বিতীয়ত লেখকের আলোচ্য কাল-পরিধির মধ্যেও সব স্বাধীনতাপ্রেমী সামরিক বিভাগের কর্মীদের উল্লেখ নেই। এই রকম একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল হাবিলদার জলেশ্বর সিং-এর নাম; ১৯১৬ খ্রি. ৩১শে মার্চ যাকে দিল্লী জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

স্বেচ্ছাআরোপিত নিয়ন্ত্রণের মূল দুর্বলতা সত্ত্বেও অনুরূপ ভাবে শেষ অধ্যায়টিও (ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল অ্যান্ড মুসলিমস্) অভিনব। আমরা আশা করব যে লেখকের পন্থানুসরণ করে নবীন যুগের ঐতিহাসিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে জবাব দেবেন এই ভ্রান্ত প্রচারের যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা গৌণ ছিল বা তাঁদের অবদান কেবল পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষেই। এই প্রসঙ্গে ক্ষুদিরামের সহায়িকা অজ্ঞাতনামা মুসলমান "দিদি" ও আশফাকুল্লা খাঁ-এর মত শহীদদের প্রেরণাকারী জীবনকাহিনীর উল্লেখ করলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে লেখক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন পর্বের কালসীমার মধ্যে নিজ বক্তব্য সীমাবদ্ধ রেখেছেন। ফলে দিল্লী জেলে ১৯৪০ খ্রি. ২০ শে মে ফাঁসিতে প্রাণোৎসর্গকারী শফিক আহমদের মত বিপ্লবী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সহায়তার অভিযোগে ১৯৪৪ খ্রি. ২৪ শে অগাস্ট ঐ দিল্লী জেলেই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদানকারী জোহুর আহমেদ এবং তাঁদের মতো বিপ্লবীদের উল্লেখ নেই। লেখকের আলোচিত কালসীমার মধ্যে হলেও ঢাকার বিখ্যাত নেত্রী শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী আশালতা সেনের আত্মকথায় (সেকালের কথা) আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার পর মুচলেকা দিয়ে ছাড়া পাবার বদলে ব্রিটিশের কারাগারে তিলে তিলে প্রাণোৎসর্গকারী মুসলমান যুবক গোলাম

জিলানীর প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি কি কেবল তিনি অহিংস সত্যাগ্রহী ছিলেন বলেই ?

পূর্বোক্ত ছোটখাট অপূর্ণতা ও নীতিগত মতভেদের কথা উল্লেখ করলেও উপসংহার প্রসঙ্গে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই সমালোচ্য গ্রন্থটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্বন্ধে এক উল্লেখনীয় দলিল। পূর্ণাঙ্গ নয় ঠিকই। এজাতীয় ইতিহাস কদাচ পূর্ণাঙ্গ হয় — বিশেষ করে ঘটনার অর্ধ-শতাব্দিরও কম কালসীমার মধ্যে। তবে উত্তরসূরীরা এই গ্রন্থ থেকে লাভবান হবেন এবং সেইখানেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শাশ্বিময় রায় ও তাঁর বর্তমান কৃতির সার্থকতা।

**The Revolutionary Nationalist Movement : Its Contribution to Indian Freedom Struggle** — Santimoy Roy/Antaranga Prakashana, 324B Jodhpur Park, Cal-68/Rs. 120/available at K. P. Bagchi & Co. 286, B. B. Ganguly St., Cal - 12.

## জাতীয় শিক্ষা

### সনাতন মিত্র

১৯০৬ সালের ১১ই মার্চ জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ-এর উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এক দীর্ঘ যাত্রা। লক্ষ্য এক নতুন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা নতুন শিক্ষানীতির উপর স্থাপিত নতুন ধারায় পরিচালিত।

তাগিদটা এসেছিল দু দিক থেকে। আসলে ওই দুটো দিক বলা যেতে পারে, এক স্বদেশি আন্দোলনেরই এদিক আর ওদিক। প্রথমত, স্বদেশ-চেতনা যেমন যেমন জেগে উঠছিল তেমনি তেমনি এই রকম একটা বোধও প্রবল হয়ে উঠছিল যে দেশের বিদেশি শাসক যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে তার মৌলিক চরিত্র বিজাতীয় এবং তার প্রভাবে দেশের যুবসম্প্রদায় জাতীয় চরিত্র হারিয়ে নিজ বাসভূমে পরবাসীতে পরিণত হচ্ছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ১৮৩৯ সালের ১২ই মে তারিখে এক সম্পাদকীয়তে যখন লিখল যে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের যুবকেরা ভারতবর্ষের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতের খোঁজখবর বেশি রাখে, অনেক চিন্তাশীল এবং চিন্তান্বিত ব্যক্তির মনোভাব প্রকাশ পেল তার সে মন্তব্যে। যে শিক্ষার মাধ্যম বিদেশি ভাষা, যার উপজীব্য বিদেশি ধ্যান-ধারণা তা দেশে যে বিদেশি ভাবাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই সৃষ্টি করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ? শ্রীঅরবিন্দ তীব্র ভাষায় এই ব্যবস্থার নিন্দা করলেন, বললেন এর চরিত্র ''anti-national''. তিনি দেখলেন ''its subordination to Government ... the discouragement of patriotism'', এবং বললেন এ অনুগত হতে শেখায় বিদেশি শাসকদের প্রতি। তাছাড়া এর আরেক গুরুতর ত্রুটি এর কোনও পাঠক্রমে নীতিশিক্ষার কোনও স্থান নেই। এই সব কারণে, যাতে মস্ত বড় একটা জাতি হিসাবে আমরা গড়ে উঠতে পারি যাতে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, সম্পূর্ণ নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্যক বলে অনেকে মনে করতে আরম্ভ করলেন।

আরেকটি যে কারণে প্রচলিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাঠামোর থেকে বেরিয়ে এসে তার সমান্তরাল অন্য একটি শিক্ষা-প্রণালী স্থাপন করা আশু প্রয়োজন বলে বোধ হল, তা হল, স্বদেশি ভাবাপন্ন অনেক ছাত্র ওই সব গোলাম-খানা পরিত্যাগ করে আসতে লাগল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ ছাত্রসমাজেও এসে লাগল। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক তো দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ডাক এল, ইংরেজদের কোর্ট-কাছারি এবং স্কুল-কলেজও বর্জন করতে হবে। ইতিমধ্যে আবার সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি নিয়মবিধি আরও কড়া হয়ে উঠেছে। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্য পুরোপুরি নিন্দনীয় ছিল না। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা তিনি যতটা সম্ভব দূর করতেই চেয়েছিলেন এবং সম্ভবত, সেই অতদিন আগেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যার শঙ্কাজনক স্ফীতিও তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছিল। সেই সব কারণেই তিনি ১৯০২ সালে এক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। নানা মহলের প্রবল আপত্তি (কলকাতার জনসভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বোম্বাইয়ে ফিরোজশাহ মেটা এবং আমেদাবাদের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে জাতীয় কংগ্রেস) সত্ত্বেও সেই কমিশনের সুপারিশের ফলে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হল এবং তার ফলে কলেজসমূহের উপর বিশ্ববিদ্যালয় এবং শেষোক্তের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বাড়ল। আপত্তির সঙ্গত কারণ ছিল, উচ্চ শিক্ষার উপর সরকারের খবরদারি, তা সে তখনকার বৃটিশ সরকারই হোক আর এখনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারই হোক, কম থাকাই ভাল। আবার শিক্ষার নিচের দিকের স্তরে মাতৃভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেছিল সে আইন, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার ব্যবস্থাও তাতে ছিল। কাজেই সবই তার মন্দ ছিল সে কথা বলা অন্যায়। সেই আইনের বলেই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণী খুললেন।



এতো গেল শিক্ষায় বিদেশি সরকারের হস্তক্ষেপের একটা দিক। আরেক দিকে,স্বদেশি আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান লক্ষ করে সরকার বিবেচনা করল তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা দরকার। বঙ্গ সরকারের অস্থায়ী চিফ সেক্রেটারি আর, ডব্লিউ, কলহিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরদের ওপর এক আদেশ জারি করলেন। তাতে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে এবং বিদেশি পণ্য বর্জন সভায় ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করা হল। সেই অনুসারে তাঁরা স্কুল কলেজের প্রধান শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের সাবধান করে দিয়ে বললেন এই আদেশের অন্যথা হলে সরকারি সাহায্য বন্ধ হবে, বিশ্ববিদ্যালয় সে-রকম ক্ষেত্রে অনুমোদন প্রত্যাহার করবে, ইত্যাদি।

অতএব, এই যারা স্বেচ্ছায় বিদেশি শিক্ষার গোলামখানা পরিত্যাগ করে আসবে কিংবা কালহিল-সার্কুলার অমান্য করার অপরাধে যেসব ছাত্র স্কুল-কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হচ্ছে তাদের শিক্ষারও একটা ব্যবস্থা চাই। কাজেই খানিকটা আদর্শের খাতিরে, খানিকটা বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে একটা সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে লাগল।

এদিকে গোলামখানাই বলুন আর যাই বলুন সেখানকার শিক্ষাই ব্যাপক প্রসার লাভ করে চলেছে, সেই শিক্ষার চাহিদা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বিংশ শতাব্দিতে পৌঁছবার অনেক আগেই ১৮৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সার আর্থার মেটল এক সমাবর্তন সভায় বললেন, ''এ জিনিষ না দেখলে বিশ্বাস হয় না''। ''For my part, I do not think anything of the kind has been seen by any European university since the Middle Ages, and I doubt whether there is anything founded by, or connected with, the British Government in India which incites so much practical interest in native households of the better classes from Calcutta to Lahore, as the examinations of the university. '' বর্তমান শতাব্দির প্রথম শিক্ষাবর্ষের শেষেই দেখা যায় প্রাক্-স্নাতক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে সতের হাজার ছাড়িয়ে গেছে, গত শতাব্দির শেষ দুই দশকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৮০ শতাংশ এবং ৪৯ শতাংশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলেই যে (যদিও তা সমাজের উচ্চতর শ্রেণীসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমাজে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারসমূহের এবং তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব জাগতে আরম্ভ করল তাতে সন্দেহ নেই। এই অশ্রদ্ধা ক্রমে মনে হল, একটা প্রাচীন সুসভ্য জাতির আত্ম-অবমাননার সামিল। এই অনুভব যাঁদের মনে তীব্র হল তাঁরা চাইলেন একটা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষের আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল। বিজ্ঞান ও বিবিধ কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এতে তেমন না থাকায় অনেকে মনে করলেন, এর ফলে শুধু যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাই নয় দেশের আর্থিক উন্নতির জন্যে যে কারিগরি দক্ষতা প্রয়োজন, যত কল-কারখানা-কর্মশালা ইত্যাদি না হলেই নয়, তারও অভাব থেকে যাচ্ছে। কাজেই, জাতীয় সত্তার কথাই শুধু নয়, জাতির এই বাস্তব প্রয়োজনের কথাও মনে রাখতে হবে, নতুন শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করবার সময়।

সে-সব মনে রেখেই জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ তাঁদের পরিকল্পনা রচনা করলেন। তিনটে স্তরে বিন্যস্ত হল শিক্ষার ক্রম, প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং কলেজি। সময়সাধনের চেষ্টা হল কলা, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার, হাতে-কলমে কাজ শেখারও ব্যবস্থা থাকল। উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরে ওই তিনটি ধারার যে কোনও একটি বেছে নেবার সুযোগ পেল ছাত্ররা। তারপর কলেজি শিক্ষার তিনটি ধারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তার সঙ্গে যুক্ত হল আরেকটি ধারা — পেশাগত অর্থাৎ ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং, শিক্ষকতা এবং আইন।

কিন্তু তাতেও তো শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, ধর্ম ও নীতি-শিক্ষারও ব্যবস্থা চাই। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর অধীন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল স্কুল ও কলেজ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিষৎ-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি ছাত্রদের উপদেশ দিলেন এমন জীবনযাপন করতে যাতে থাকবে ''ascetic simplicity, spotless purity and rigid discipline''. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থাকবে না। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মমত অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ব্যবস্থা, বলতে গেলে বাধ্যতামূলকই ছিল, কেননা যেসব দানের ওপর জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ দাঁড়িয়ে ছিল তার মধ্যে অগ্রণণ্য দানটির শর্ত ছিল যে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট একটি অঙ্ক প্রতি বৎসর ব্যয় করতে হবে। ছয় সদস্যের এক কমিটি বিভিন্ন স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার একটি পাঠক্রমও রচনা করেছিলেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা ছিল শুধু হিন্দু ছাত্রদের জন্য কেননা যাদের আর্থিক আনুকূল্যে এই শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছিল তাঁরা তাই চেয়েছিলেন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যেও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা পরিষৎ-এর ছিল, যদি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কেউ করে দিতেন। তা আর হয়নি। যাই হোক এখনকার দিনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, এর ফলে দেখা গেল বর্তমান শতাব্দির মধ্যভাগ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ-এর পরিচালিত বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট-এ এবং তার উত্তরসূরী যাদবপুর কলেজ অব ইনজিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে মেকানিকাল,

ইলেকট্রিক্যাল এবং কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ছাত্ররা ধর্মবিষয়ক আলোচনা শুনছেন এবং গীতা, উপনিষদ ইত্যাদির উপর প্রচুর নোট নিচ্ছেন, দেখা যেত।

এত কথা বলার পরে এবার স্বীকার করা দরকার এ সব তথ্যের, এই ইতিহাসের অনেকটাই বর্তমান সমালোচকের অজানা ছিল, এবং অজানাই থেকে যেত, যদি না আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর হাতে পড়ত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় যে পরিশ্রমে এবং যত্নে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর ঐই ইতিহাসখানি রচনা করেছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। প্রচুর পরিমাণে তথ্য তিনি নানা মৌলিক সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন (শিক্ষার নানা স্তরের বিস্তারিত পাঠক্রমসমূহ তেমনি একটি মূল্যবান প্রাপ্তি), অহেতুক নিজের মতামত কখনও বিবৃত ইতিহাসের উপর চাপিয়ে দেননি এবং অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভারে তাঁর বিবরণকে কোথাও ভারাক্রান্ত হতে দেননি। অথচ কী রকম উদ্দীপনার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, সমাজের নানাস্তর থেকে কতজন কতরকম অর্ঘ্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, কত যত্নে কত ভালবাসায় শিশু চারা গাছটিকে বড় করে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন সে সব বৃত্তান্তেও কোনও ফাঁক রাখেননি লেখক। যে কয়েকটি চরিত্র এই কাহিনীর মধ্যে থেকে অন্য সকলের ওপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তাঁদের মধ্যে একজন ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেই অসামান্য মানুষটিকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়ে তিনি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। আরও কত নাম জ্বলজ্বল করছে এই ইতিহাসের পাতায় পাতায়, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর , সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত... নামের শেষ নেই।

তবু কেন সত্য অর্থে সফল হল না, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সফল হল না, এত জনের এত আগ্রহের, এত উপযুক্ত মানুষের এত পরিশ্রমের এই কর্মোদ্যাগ ? কতকগুলো কারণ খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যাবে ; যেমন স্বদেশি আন্দোলনে জোয়ারের পর ভাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে লোকের আগ্রহেও ভাটা পড়ে যাবে, তাই স্বাভাবিক ছিল। তার চেয়েও বড় কারণ ছিল যা শেষ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ-এর উন্নতির পথে এক মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল, তা হচ্ছে, এঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্রদের চাকরি-বাকরি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। কারিগরি শিক্ষার দিকটাতে, ইনজিনিয়ারিং-এর নানা শাখায় অবশ্য এ অসুবিধা ততটা প্রবল ছিল না। কেন-না সেইসব পাশ করা ছাত্রদের একটা চাহিদা ছিল। অন্যরা অন্নসংস্থান নিয়ে সমস্যায় পড়তে লাগলেন। সরকারি চাকরির দরজা তো তাদের সামনে একদম বন্ধ, কেননা সরকার প্রথম থেকেই বিষনজরে দেখেছিল এই প্রতিষ্ঠানটিকে।

সে দিক থেকে দেখলে কারিগরি এবং ইনজিনিয়ারিং-এর দিকে প্রতিষ্ঠানটিকে সফলই বলতে হয়, বেঙ্গল ইনস্‌টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে যাদবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ, তা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ভর্তি হবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের ভিড় বেড়েই চলেছে।

কিন্তু তাতেই কি বলা যায় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ-এর ইতিহাস সাফল্যের ইতিহাস ? কোথায় সেই সমান্তরাল শিক্ষা-ব্যবস্থা ? নাই বা থাকল বিদেশি শাসন, স্বাধীন ভারতেও তো প্রয়োজন ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিগদর্শনের।

যা যা দোষত্রুটি সেই আমলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ছিল তার সবই এখনও বহাল তবিয়তে বর্তমান, বরং জনসংখ্যার স্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আর কেউ ভুলেও মনে করেন না, এর কোনও প্রতিকার সম্ভব। কেউ কল্পনাও করেন না, আরেকটি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ স্থাপন করে নতুন কোনও লক্ষ্যের দিকে যাত্রা আরম্ভ করা যায়।

**Fifty Years of National Education** — Dr. Amitabha Mukherjee / National Council of Education, Bengal, Calcutta - 700 032 / Rs. 50.00

## শিক্ষার 'হরিণবাড়ি'

**পুলক নারায়ণ ধর**

স্বাধীনতার পর ভারতের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার জন্য বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং আজও চলছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার কোন দিশাই আমরা পাচ্ছি না। রাধাকৃষ্ণন কমিশন থেকে শুরু হয়ে হাল আমলের অশোক মিত্র কমিশন কোন কমিশনের সাহায্যেই আমরা সমস্যার তল পাচ্ছি না। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন আমাদের শিক্ষার প্রধান গলদ বলে চিহ্নিত করেছিল পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ("broadly alternates between slackness and strain — slackness during the session and strain at the time of examination")। এর পর আরও অনেক কমিশন বসেছে ; কিন্তু সেই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় তাঁরা কেউ বাতলাতে পারেননি।



আসলে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোর মৌলিক কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের কথাই আমরা ভেবেছি। তাই মূল ব্যবস্থাটা পরীক্ষাকেন্দ্রিকই থেকে গেছে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সমস্যা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। এর ওপর মেঠো গণতন্ত্রের দাপটে যত্রতত্র জনপ্রতিনিধিদের চাপে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একথা প্রায় সব কমিশনই স্বীকার করেছে। এমনকি বহু বিতর্কিত 'চ্যালেঞ্জ অফ্ এডুকেশন' নামক দলিলেও স্বীকার করা হয়েছে (Neither colleges nor even universities are started after due consideration of academic need)। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির দিকে নজর দেবার কথা ঘোষণা করেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার কাজটিতে তাঁরা হাত দেন। এতে শিক্ষক সম্প্রদায় দলমত নির্বিশেষে খুশি হন। এরপর ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলে ইংরেজি তুলে দেওয়া ও রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' খারিজ করায় সারা দেশ জুড়ে তুমুল হই হট্টগোল শুরু হল। সরকার অনড় রইলেন। পরবর্তী কালে শিক্ষাব্যবস্থার সমীক্ষার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভবতোষ দত্তর নেতৃত্বে এই কমিশনের নাম হল ভবতোষ দত্ত কমিশন (১৯৮৬)। ভবতোষ দত্ত কমিশন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রধানত তার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু ভবতোষ দত্ত কমিশনের সুপারিশগুলি বেশির ভাগই শিক্ষা দপ্তরের মনঃপূত না হওয়ায় সেই কমিশন নিয়ে তেমন হই-চইও তোলা হল না। সরকারের সুরক্ষিত লোহার খাঁচায় তা বন্দি হয়ে রইল।

এরপর সরকার গঠন করলেন বামফ্রন্টের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী (বর্তমানে সাংসদ) ডঃ অশোক মিত্রের নেতৃত্বে মিত্র কমিশন (১৯৯১)। ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশগুলির সঙ্গে সরকারি নীতির অতিরিক্ত মিল পাওয়া গেল। সুতরাং বোঝা গেলে সরকার মাঝে মাঝেই তার নীতি কার্যকর করবেন ঝুলি থেকে অশোক মিত্র কমিশনের কপি বের করে। বামফ্রন্টের যাঁরা রাজনৈতিক বিরোধী তাঁরা যে এই কমিশন সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করবেন সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অশোক মিত্র কমিশনের সমালোচনা শুধু বামফ্রন্ট বিরোধীদের মধ্যেই নয়, এই রিপোর্টের বিরোধী সমালোচকদের মধ্যে বামফ্রন্টের সমর্থক ও বামমার্গী বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া যাবে। আর এই সমালোচকদের মধ্যে বামফ্রন্টের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এবং বিধানসভার স্পিকার ও সি. পি. আই(এম)-এর প্রথম সারির নেতা মনসুর হবিবুল্লাহ্-এর নামও যুক্ত হতে দেখে কৌতূহল ও বিস্ময় যুগপৎ আমাদের এ বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে।

বামফ্রন্টের নতুন শিক্ষানীতি ও অশোক মিত্র কমিশনের সুপারিশগুলি সম্পর্কে মনসুর হবিবুল্লাহ্ সাহেব একটি বই রচনা করেছেন। বইটির নাম 'আধুনিক তোতাকাহিনী'। বইটির নামকরণের মধ্যেই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট। 'দেশ' ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের দুটি রচনাসহ অন্যান্য রচনা বইটিতে স্থান পেয়েছে। হবিবুল্লাহ্ সাহেব প্রথমেই 'কৈফিয়ৎ'প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন "বামফ্রন্ট সরকার দ্বারা গঠিত ডঃ অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে যে সব মন্তব্য করেছি সেগুলি শুধু কমিশনের মতে বিপক্ষে নয়, বামফ্রন্টের অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থারও বিপক্ষপাতী বলে মনে করা যেতে পারে" (পৃঃ ১)। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলছেন, "আমাদের সমালোচনার উদ্দেশ্য বামফ্রন্ট বিরোধিতা নয়। আসলে একটি শ্রেণীবদ্ধ সমাজে এক ধরনের শিক্ষা পদ্ধতিতে সব স্তরের সব শিক্ষার্থীকে চালনা করার পদ্ধতিটা ভুল বলে মনে করি। দ্বিতীয়ত আমরা মনে করি যে নতুন ব্যবস্থা চালু করার আগে তার অনুকূলে জনমত সৃষ্টি করা দরকার এবং জীবন সংগ্রামে তার অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা দরকার। সেইগুলো না করে নতুন ব্যবস্থা করা গ্রহণ করে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যেটা বামফ্রন্টের বন্ধুরাও গ্রহণ করতে পারছেন না"।

হবিবুল্লাহ্ সাহেবের এই দৃষ্টিভঙ্গি নিছক তাত্ত্বিক অবস্থার থেকে আসেনি। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এই দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বামফ্রন্টের আমলেই প্রতিষ্ঠা করার "অপরাধে" তিনি "অপরাধী"। এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক ও কায়েমি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর বাধার সম্মুখীন হন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সামগ্রিক সমস্যাটা বোঝবার চেষ্টা করেছেন।

লেখকের মতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাটি "পুরাতন কাঠামোর ভিত্তিতে" প্রসারিত হয়েছে মাত্র। নতুন কোনও ব্যবস্থা নয়। এই ব্যবস্থাটি আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে কারণ তাকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "অন্যতম কর্মক্ষেত্র বা বেকারি উদ্ধারের কাজে লাগানো হচ্ছে" (পৃঃ ৬)। হবিবুল্লাহ্ এই বক্তব্যের বিস্তারিত আলোচনা না করলেও আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কলেজের সংখ্যা ছিল মাত্র নব্বইটি। উচ্চবিদ্যালয় ছিল ১,১০৭টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ১৪,৭৮৩টি। পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ২১ লক্ষ এবং শিক্ষক ছিলেন প্রায় ৭১ হাজার এর মতো। বাজেটের মাত্র ৯.৩% বরাদ্দ ছিল শিক্ষাখাতে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯ (একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়), ৩১২টি সাধারণ কলেজ, উচ্চবিদ্যালয় প্রায় ৬ হাজারটি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০ হাজারের

বেশি। শিক্ষকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৯০ হাজারের মতন। প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা যেখানে ১৯৫০-৫১ সালে ছিল মাত্র ৪৩ হাজার, ১৯৮০-৮১ তে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৯ হাজার অর্থাৎ শিক্ষা দেবার অনেক কল তৈরি। একজন বিশেষজ্ঞের মতে "In the rural areas, this has strengthened the position of the jotedars and rich peasants in the hierarchy. Educated members of these classes have adopted the teaching profession as a subsidiary occupation. They ... invest their cash earnings from their subsidiary occupation in land... and thus enhance their social and economic position" (Education : Politics and Social Structure - Poromesh Acharya, Education and the Process of Change, Ed. by Ratna Ghosh / Mathew Zachariah P. 68).

শিক্ষাখাতে সরকারকে তার বাজেটের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ ব্যয় করতে হয়। এর প্রায় পুরোটাই শিক্ষকদের মাইনে দিতেই চলে যায়। 'চ্যালেঞ্জ অফ এডুকেশন'-এ কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগও এই পরিপ্রেক্ষিতে বলেছে : "More than 90 percent of the expenditure (in some states even more than 98 per cent) is spent on teachers' salaries and administration. Practically nothing is available to buy a black-board and chalks, let alone charts, other inexpensive teaching aids or even pitchers for drinking water" (পৃঃ ৩৭)।

হবিবুল্লাহ্ সাহেবের মতে "শিক্ষকতাকে চাকুরি হিসাবে আকর্ষণীয় ভাবা হয়। দেশের ছেলেমেয়েকে পড়ানোর মনোবৃত্তি এক্ষেত্রে প্রধান নয়। ... অর্থাৎ শিক্ষকতা এখন আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট স্কিম কিংবা ডবল ইন্‌কাম স্কিমের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে" (পৃঃ ৬)।

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভদ্রকুলের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের আর্থিক ব্যবধান বাড়ছে। এটাই লেখকের মতে "মূল প্রশ্ন" বা সমস্যা। কিন্তু "আমাদের শিক্ষা কমিশনগুলি এই মূল প্রশ্নগুলির প্রতি মোটেই তাকাননি। এমনকি সম্প্রতি বামফ্রন্টের উদ্যোগে গঠিত ডঃ অশোক মিত্রের কমিশন পর্যন্ত এ ব্যাপারে নজর দেননি" (পৃঃ ৭)।

শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান নিম্নগামী হওয়ার যে কারণগুলি লেখক উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়া এবং শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারটি "অতি জঘন্য আকার ধারণ"ই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর। "যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ অপেক্ষা প্রভাবকেন্দ্রিক নিয়োগ চালু হয়েছে।" এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি বামফ্রন্ট-এর রাজনৈতিক সততাকেও বিপন্ন করেছে।

উচ্চশিক্ষার দরজা দরাজভাবে খুলে রেখে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ও দশের বোঝা করে রাখা হয়েছে— লেখকের এই মতের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষই একমত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এর প্রয়োজন বেশির ভাগ পড়ুয়ারই নেই। শুধু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর চাকুরির সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত উচ্চশিক্ষালয়গুলি অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে প্রতীক্ষালয়ের ভূমিকা পালন করে মাত্র। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথা উঠেছে।

শিক্ষাকে সমগ্রভাবে সরকারনির্ভর রাখার যুক্তিসঙ্গত কোনও কারণ আছে বলে লেখক মনে করেন না। কারণ "যাঁরা প্রাইভেট স্কুলে পয়সা দিয়ে পড়াতে পারেন তাঁরা সেই রকম শিক্ষাব্যবস্থা পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন"। লেখকের প্রশ্ন "তা হলে কলেজ এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষায়, ডাক্তারি, কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় ওই ব্যবস্থা কেন চলবে না ?" অবশ্য "শিক্ষাকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে" চালু করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তিনি পক্ষপাতী।

আসলে বামফ্রন্ট সরকার জনপ্রিয় রাজনীতি করতে গিয়ে শিক্ষানৈতিক উদ্দেশ্য পালন করছেন না। এইটিই আসল কথা। "বামফ্রন্টের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা আসলে শিক্ষা প্রসারের নামে বেকার উদ্ধার"। তাই স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি করেও "গুণগত মান অতি নিম্নে" (পৃঃ ১৫)। তবে ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের 'শিক্ষা কর' বা সেস্ প্রবর্তনের প্রস্তাবে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু গ্রামে গ্রামে স্কুল কমিটি করে স্কুলগুলির "তদারকি" ব্যবস্থার সুপারিশ তাঁর কাছে অবান্তব ও "ফাঁকা বুলি মাত্র" বলে মনে হয়েছে। যে সব স্কুলে পরীক্ষার ফল ভাল হয় তাদের প্রতি কমিশনের কটাক্ষ লেখক সমর্থন করেননি, এবং কমিশনের দুর্বলতা বলেই মনে করেন।

ইদানিং কালে সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যে প্রশ্নটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা হল প্রাথমিক স্তরে 'ইংরেজি' ভাষা শিক্ষার বিষয়টি। এ বিষয়ে লেখকের মত খুব পরিষ্কার। তাঁর মতে "প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার সাথেই ইংরেজি পড়ালে ছাত্রদের মাথায় বজ্রপাত হবে, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই" (পৃঃ ৩৪)। কারণ, "শৈশবই দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষা শুরু করার উপযুক্ত সময়" (পৃঃ ৪০)।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে গ্রামাঞ্চলে ইংরেজি পড়াবার যদি অসুবিধা থেকে থাকে শহরাঞ্চলে বা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার কোন অসুবিধা আছে বলে তাঁর মনে হয় না (পৃঃ ২৩)। এ প্রসঙ্গে তথাকথিত "দু রকম শিক্ষাব্যবস্থা" চালু হবার বিরোধী যুক্তি নস্যাৎ করে



তিনি বলেছেন "ঈশ্বরের কৃপায় দুরকম কেন আমাদের অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুযায়ী দশরকম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। কমিশন এই বাস্তব অবস্থা জেনেও চোখ বুজে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন" (পৃঃ ২৩)। রাজনীতি ও অন্যান্য কারণে এক কালের ভাল বাংলা স্কুলগুলির মান নিম্নগামী হওয়ায় অভিভাবকরা ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলির দরজায় ভিড় করেন। সেখানেও বাংলা ভালই পড়ানো হয়। এই সকল অভিভাবকরা ঔপনিবেশিক দাস মনোবৃত্তির অনুকারক নন। তাঁদের বেশির ভাগই কোন না কোনও ভাবে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বা সমর্থক। "এঁরাও রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত চর্চা করেন।"

আসল গলদ অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার অর্পণ করা। প্রাথমিক স্কুলের কোন শিক্ষক যদি "ছবি সহযোগে বি-এ-টি — ব্যাট, সি-এ-টি — ক্যাট্ পড়াতে না পারেন তা হলে বাংলাও তিনি পড়াতে পারবেন না।" এর জন্য দায়ী "স্বজন পোষণ নীতি" এবং "বেকার উদ্ধারের দৃষ্টিভঙ্গি" (পৃঃ ২৫)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও মান বাড়েনি। "অভ্যন্তরীণ কলহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সে সব দিকে কমিশন নজর বিশেষ দেননি বলেই আমাদের মনে হয়। শিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষক-এর পরিচর্যাটাই মূল কথা" (পৃঃ ২৭)। শিক্ষার সর্বস্তরে বেতন "নিশ্চিত করানোর কার্যক্রম সম্বটাপন্ন" (পৃঃ ২৮)। শিক্ষার গাড়িটি এখন "কাদায় পড়ায়" সরকার বিভিন্ন স্তরে ছাত্রদের টিউশন ফি চালু করার কথা ভাবছেন। কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গির-র পরিবর্তন না করে এই ধরনের অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা "বিরূপ প্রতিক্রিয়া" সৃষ্টি করতে বাধ্য।

এই ধরনের সমালোচনা যে বামফ্রন্ট সরকার সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না লেখক সে সম্বন্ধে নিশ্চিত। কারণ "বর্তমানে বলতে গেলেই সেটা বামফ্রন্ট বিরোধীদের ও ইংরেজ পদলেহীদের উক্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে"। লেখক বলছেন এরাই হচ্ছেন "আধুনিক তোতা"। "এরা প্রথমে দু-তিন বার রাধাকৃষ্ণ বলে দুবার ঠোঁটের ভিতর আস্তে আস্তে মুদালিয়ার বলেন তারপর কোঠারি কোঠারি বলে এমন চিৎকার দেন যে সমস্ত প্রতিপক্ষ ধূলিসাৎ হয়ে যায়" (পৃঃ ৩৩)।

হবিবুল্লাহ্ সাহেব মনে করেন এভাবে মানুষের মনকে বাদ দিয়ে "টন টন ওজনের কমিশন রিপোর্ট দিয়ে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায় না"। একথা নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' প্রবন্ধে অনেক আগেই লিখছেন "আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়"।

হবিবুল্লাহ্ সাহেব ও অশোক মিত্র কমিশন উভয়েই কিন্তু একটি গুরুতর বিষয় এড়িয়ে গেছেন। বিষয়টি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন। বামফ্রন্ট আমলে পুরাতন অরাজকতা পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে অনেকটা দূর হলেও এবং সময়মত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলেও ইদানিং উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যে অ্যাকাডেমিক কেচ্ছা চলছে তাতে সকলেই স্তম্ভিত। স্কুলের স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত এই 'ক্যাজাল' অব্যাহত। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষা কর্তৃপক্ষের স্নেহলালিত অযোগ্য পরীক্ষকদের দিয়ে মূল্যায়ন বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগও শিক্ষকমহলে উঠেছে। এই সব ঘটনা বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন 'অরাজকতা'। এ যেন বাইরে থেকে ঢিল না মেরে ভেতর থেকে 'সাবোতাজ' করার নতুন পদ্ধতি। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়ছে হতাশা ও গ্লানি এবং শিক্ষক সমাজের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভ।

'তোতাকাহিনী'র রাজা মূর্খ পাখিকে শিক্ষা দিতে বানালেন সোনার খাঁচা। রাশি রাশি পুঁথি থেকে পাতা ছিঁড়ে লাঠির ডগা দিয়ে পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হল। পাখির গান বন্ধ হল। চিৎকার করার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বুজে গেল। এ হল সে কালের 'তোতাকাহিনী'।

কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সেই ট্রাডিসন আজও চলেছে। তার ভয়ংকর তেজ বিদ্যুমাত্র স্তিমিত হয়নি। একদা পুরানো কলকাতার হরিণবাড়ি ছিল জেলখানা। রবীন্দ্রনাথ সে কালের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করে হরিণবাড়ি সঙ্গে তুলনা করে ছিলেন। কিন্তু আমরা কি আজও সেই হরিণবাড়ির খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি ? এই জিজ্ঞাসা সামনে রেখেই মনসুর হবিবুল্লাহ্ সুন্দর সহজ ভাষায় আধুনিক শিক্ষার দুর্বল দিকগুলি তুলে ধরেছেন এবং যথার্থ উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমস্যাগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন।

বইটির পরিশিষ্টে শ্রী কান্তি বিশ্বাসের (গণশক্তি'তে) ও অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের ('দেশ' পত্রিকায়) পূর্বপ্রকাশিত দুটি প্রবন্ধও সন্নিবিষ্ট হয়েছে হবিবুল্লাহ্র সমীক্ষাসহ। এ ছাড়া শেখ সাইদুল এবং আরফা কমিশন-কৃত মিত্র কমিশনের কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশের সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ বইটির মূল্যবান সম্পদ। শিক্ষার সঙ্গে যাঁরা পেশাগত ভাবে যুক্ত এবং শিক্ষা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেন তাঁদের সকলের কাছেই এই বইটি সমাদৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**আধুনিক তোতাকাহিনী—বর্তমান শিক্ষানীতির পর্যালোচনা** — মনসুর হবিবুল্লাহ্ / অক্ষরম প্রকাশনা - ৩২৪ বি যোধপুর পার্ক কল-৬৮ / প্রাপ্তিস্থান — দে বুক স্টোর, বুকমার্ক, মনীষা।

# লৌকিক গান নিয়ে গবেষণা

## সুধীর চক্রবর্তী

একটি মাত্র উপন্যাস লিখে প্রতিভা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে গেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম' ১৩৫২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ থেকে আশ্বিন — তিন সংখ্যা মাসিক মোহম্মদী পত্রিকায় প্রথম বেরোয়। সেটা ছিল অনেকটা খসড়া রচনা। পরে উপন্যাসটি মার্জিত ও বর্ধিত করে লেখক পুস্তকরূপ দেন (১৩৬৩)। সেটাই তাঁকে কালজয়ী করে। যদিও 'তিতাস একটি নদীর নাম' এবং তার লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের যে খ্যাতি তা মরণোত্তর। তাঁর যে অন্য ধরনের বেশ কিছু গদ্য রচনা অন্যত্র মুদ্রিত ছিল সে খবর আমাদের অজ্ঞাত ছিল। দেবীপ্রসাদ ঘোষ শ্রমে ও ভালবাসায় পুরানো পত্রপত্রিকার পাতা ঘেঁটে সেই রচনাগুলি উদ্ধার করে প্রস্তুত গ্রন্থ 'বারমাসী গান ও অন্যান্য' নামে সংকলিত করেছেন। বাঙালি সারস্বত সমাজ দেবীপ্রসাদকে তাঁর এই সৎপ্রয়াসের জন্য দুহাত তুলে অভিনন্দন জানাবেন। সুন্দর ও তথ্যময় একটি ভূমিকা লিখে এবং রচনাগুলির উৎসনির্দেশ করে তিনি কাজটি সম্পূর্ণ করেছেন। বাংলা সাহিত্যের দিকে দিকে দিঙনাগ সম্পাদকদের দাম্ভিক দাপটের পাশে তাঁর সুষ্ঠু ও প্রসমস্তর সম্পাদনা মুগ্ধ করেছে।

১১৮ পৃষ্ঠায় শীর্ণ অবয়বের বইখানিতে ২২টি ছোট নিবন্ধ রয়েছে। তারমধ্যে ১৮টি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায়, যেখানে তিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত ছিলেন সহ-সম্পাদক (সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র) এবং ১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ ছিলেন সম্পাদক। এ রচনাগুলি লেখার সময় তাঁর বয়স পঁচিশও হয়নি এ খবরটুকু প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক এ-খবরও যে, ঐ সময় আমাদের লোকসংস্কৃতিচেতনা ছিল একেবারে শৈশব স্তরে। ফোক পণ্ডিতদের দাপাদাপি তখনও শুরুই হয়নি। সম্পাদক দেবীপ্রসাদ যথার্থই বলেছেন :

> মাত্র বাইশ বছর বয়সে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণ কী গভীর অনুসন্ধানী ছিলেন। বর্তমান সময়ে এ-কাজ যতটা সহজ ও প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে উঠেছে, আজ থেকে পঞ্চাশেরও বেশি বছর আগে সেটা ছিল বেশ দুরূহ। এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরে বসে কাজের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা নিতান্ত বিলাস ছাড়া আজ আর কিছু মনে হতে পারে না।

শেষ বাক্য সম্পর্কে অবশ্য বিতর্ক ওঠে কেননা সে সময়ে এখনকার মতো প্রতিষ্ঠানের রবরবা ছিল না, লিখে টাকাও তেমন পাওয়া যেত না, সব কাজই ছিল ব্যক্তিগত উদ্যম ও ভালবাসার।

যাইহোক, অদ্বৈত মল্লবর্মণ 'নবশক্তি' কাগজে সেকালের দিনে সংক্ষিপ্ত হলেও পল্লীবাসী বাঙালির যে সব লৌকিক গান সম্পর্কে নিবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলি এতদিনে দুই মলাটের পরিধিতে আমাদের হস্তগত হল এটাই মস্ত ঘটনা। শেওলার পালা, বরজের গান, জল সওয়া গীত, নাইওরের গীত, ভাইফোঁটার গান, পরিহাস সঙ্গীত এমনতর নানা আধোজানা বিষয়, যা মূলত মল্লবর্মণের বালা-কৈশোরের স্মৃতির অন্তর্গত, এখানে রয়েছে। লেখাগুলি সংক্ষিপ্ত (হয়ত নবশক্তির অবয়বের জন্য) মনে হয় বিশেষত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের পল্লীসংক্রান্ত রচনাগুলির বর্ণনাবহুলতার প্রতিতুলনায়। অদ্বৈত তাঁর বিষয়পরিধি গ্রাম্য গানের পাশে ব্যাপ্ত করেছেন অন্যান্য প্রসঙ্গেও। যেমন — এ দেশের ডিঙ্গরি সম্প্রদায়, প্রাচীন চীনা চিত্রকলার রূপ ও রীতি, টি. এস. এলিয়ট, আম্রতরু, রোকেয়া জীবনী। সবই অতি সংক্ষিপ্ত তৎসাময়িক রচনা। ১৯৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে করে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাটি প্রণিধানযোগ্য এবং কৌতূহলপ্রদ।

'উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা'-র লেখক বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্য স্বীকৃত আমার গবেষণাপত্রের পরিমার্জিত সংস্করণ'। এ-জাতীয় বইয়ের চেহারা ও চরিত্র যেমন হয় এটিও তাই এবং সামনে আছে একজন প্রবীণ অধ্যাপকের ভূমিকা, সেটাও প্রথাগত। গবেষণা পরিচালক, যাঁর পরিচিতি 'পি. এইচ. ডি এবং ডি. লিট (ডাবল)' তাঁর উৎসাহের কথা বলা হয়েছে, গবেষণাপত্রের তিনজন পরীক্ষকদের নামোল্লেখ আছে, যা বর্তমান বইটির পক্ষে ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। এই যদি হয় পরিমার্জনের নমুনা তাহলে না জানি মূলে কী ছিল।

বিমলবাবু বইটি লিখতে ব্যাপক অনুসন্ধান ও শ্রম করেছেন তার চিহ্ন বইটির মধ্যে সহজপ্রাপ্য, কিন্তু থিসিস লেখার যে অ্যাকাডেমিক ছক অলক্ষ্যে তাঁকে প্ররোচিত করেছে তার ফলে বইটি সাধারণভাবে সুখপাঠ্য হয়নি। হয়নি তথ্যের ভারে এবং প্রসঙ্গের বিস্তারে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক রূপরেখা, আদিবাসী জীবন ও জনযাত্রা, তাদের সংখ্যাতত্ত্ব, নদ-নদী-জলবায়ু-মাটি আদি ভাষা ও ভাষাবর্গ এমনকি ব্যাকরণ পেরিয়ে পৌঁছে উত্তরবঙ্গের লোকধর্ম ও লোকাচার প্রসঙ্গে। এরপরে আসে লোকসঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তার প্রতিতুলনা, লোকসঙ্গীতে জন-জীবনের প্রতিফলন বিষয়ক আলোচনা। তারপরে আসে ভাওয়াইয়া গানের ইতিহাস, নামকরণ বিষয়ে মতান্তর, তার উৎপত্তি ও প্রতিবেশ, এ-গানের রূপভেদ, সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য (ছন্দ, তাল ইত্যাদি) ও অন্যান্য লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তুলনা। প্রসঙ্গ এবারে ঘুরে যায় উত্তরবঙ্গের সাহিত্য,



তাতে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা, রাজবংশী সাহিত্য প্রসঙ্গে। আবার আসে ভাওয়াইয়া গানের সাহিত্য ও শিল্পমূলোর কথা তার প্রতীক ও আলঙ্কারিকতা। এরপরে চটকা গান, তার স্বরূপ - বিষয়বৈচিত্র্য - ছন্দ - রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট - সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নারীজীবন এবং ভাওয়াইয়া ও চটকার মধ্যে তুলনা। বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠা এতসব বিচিত্র এবং বহুস্তরের বিষয়ে ভরে আছে—একুনে ৭টি অধ্যায় এবং ২২টি প্রসঙ্গ। গবেষণা গ্রন্থের অভ্যস্ত পরীক্ষকবর্গ এমন একঘানি তথ্যবহুল বহুপ্রসঙ্গিত রচনা যত সহজে পরিক্রমা করে ফেলতে পারবেন সাধারণ রসজ্ঞ পাঠক ততটা পারবেন না, তাঁকে পদে পদে থমকে যেতে হবে, তবু জানতে পারবেন বহু সংবাদ। সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা গানের উৎপত্তি ও প্রসারক্ষেত্রের একটা মানচিত্র থাকলে বেশ হত, এসব গানের সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ ও ছবি থাকলে লেখাটি হয়ে উঠত অনেক স্পষ্ট ও দৃষ্টিবাহিত।

তবে এ-বইয়ের প্রধান সম্পদ লেখকের অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্য নয়, ১২৪ পৃষ্ঠা ধরে সংকলিত ভাওয়াইয়া গানের সম্ভার, যা তিনি শব্দার্থ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। খুশি হওয়া যেত সেই সঙ্গে দুটো চারটে স্বরলিপি থাকলে। অবশ্য গান সংগ্রহের উৎস বহুস্থলেই নানা বই ও রেকর্ড — সেটা খানিকটা অতৃপ্তি জাগায়। অস্বস্তি লাগে যখন দেখি 'মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে' এই আধুনিক সিনেমায় বানানো গানখানাও সংকলনে রয়েছে। ধন্দ লাগে যখন লেখক বলেন, 'সাহিত্যে প্রতীক ধর্মের আরোপ শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ফরাসী সাহিত্যে। প্রতীকীবাদের প্রবক্তা ফরাসি লেখক রিমাঁদ (Reimbaud) এবং স্তিফান মালার্মে (Stephane Mallarme)।' র‍্যাঁবো-র উচ্চারণ রিমাঁদ একটু দুঃসাহসী। আর প্রতীকবাদ উনিশ শতকের শেষে শুরু, আর্থাৎ সিইমনসের এই মত আজ আর চলে কি ?

দীনেশচন্দ্র সিংহ রচিত ও সংকলিত বই 'পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত' খুব বড় মাপের বই, সব অর্থে। এর মধ্যে যেন একটা হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস, ফেলে আসা সৃষ্টিযুগের জন্য দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে। পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, হায়, কোথায়ই বা সমৃদ্ধ গীতিময় পূর্ববঙ্গ আর কোথায় সেই পরিযায়ী পাখির মতো কবিগায়ক, যাদের বলে কবিদার ! সারা জনপদ ঢুঁড়ে তাঁরা চটজলদি রচনা করতেন কত গান, কী গভীর ছিল তাঁদের শাস্ত্রপুরাণের জ্ঞান, কত অনায়াস স্বতাবকবিত্ব ! কবিপরম্পরার বহতা ঐতিহ্য, গুরুশিষ্যের অগ্রসৃতি আর আগ্রহী অনুরাগী শ্রোতৃমণ্ডলী আজ কোথায় পাব তারে ? দেশ-ভাগের পাপ মানুষকে করে নির্বাসন, কেড়ে নেয় জীবনের উজ্জ্বল যাপনগত ঋদ্ধি, বঞ্চিত করে তাকে গানের সুরময়তা থেকে। দীনেশচন্দ্রের মতো মরমী গবেষক নবপ্রজন্মের জন্য করে যান সাক্ষর ডকুমেনটেশন।

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল ও কবিগান ব্যাপারটা কত আত্মগর্ব ও পরম্পরাবাহিত সম্পদ্রতায় বহতা তা বুঝতে গেলে কবি নকুলেশ্বর সরকারের রচনাংশের সাহায্য নেওয়া যায়, জানা যায় কবিগানের অবসান কেমন করে ঘটেছে। নকুলেশ্বর লিখেছেন :

| | |
|---|---|
| গোটা বাংলাদেশটা জুড়ে | ঢোল কাঁসী আর সানাইর সুরে |
| কবির কণ্ঠে ঝরে পড়ে | মধুর সুরের রেশ। |
| বঙ্গবিভাগ হবার ফলে | সকল গেল রসাতলে |
| যবনিকার অন্তরালে | ডুবে গেল দেশ ।। |
| বাংলা পড়ল পাকিস্তানে | রাষ্ট্র পেল মুসলমানে |
| দেশবরেণ্য কবিগানে | ভাটা পড়ে যায়। |
| পড়ে পাকিস্তানের হাতে | দেশবিভাগের সাথে সাথে |
| সেই কবিগান বাংলা হতে | অবলুপ্ত প্রায় ।। |
| স্বনামধন্য কবি যত | কেউ জীবিত কেউ বা মৃত |
| সবাই হয়ে বাস্তুচ্যুত | করে পলায়ন। |
| প্রাণ বাঁচাবার অভিলাষে | পশ্চিমবঙ্গে ছুটে এসে |
| ঘৃণ্য যাযাবরের বেশে | করেন কালযাপন ।। |

কবিদারের রচনায় এইভাবে ধরা পড়েছে আমাদের শিল্পী-সমাজের তথা বিশিষ্ট শিল্পরূপের ক্রম-অবলুপ্তির ইতিহাস। তর্জাপ্রিয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে সঙ্গীতময় ভাববহুল কবিগান সমাদর পায়নি, বাস্তুচ্যুত কবিদাররা তাই আস্তে আস্তে মেনে নিয়েছেন সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে নীরব সাডিমান নিষ্ক্রমণ। আজ প্রকৃত অর্থে তাই কবিয়াল আর নেই, কবিগানই বা থাকে কী করে ?

এইখানেই দীনেশচন্দ্র সিংহের কাজের আসল গুরুত্ব। প্রস্তুত বইটিতে তিনি পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যময় কবিসঙ্গীতের বহুতর নমুনা, কবিপরিচয় এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে তাঁদের ফটোগ্রাফ জোগাড় করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি আমাদের সকল বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। একদা উনিশশতকে গুপ্ত কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে কবিগান ও কবিজীবনী সংগ্রহ করে যে-নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার করেছিলেন, দীনেশচন্দ্রের কাজ তারই পরিপূরক তাতে সন্দেহ নেই।

দীনেশচন্দ্রের কাজটি সহজ ছিল না। বাস্তুচ্যুত, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা, অস্তিত্বরক্ষায় নানা ভাবে বিব্রত ও শঙ্কিত উদ্বাস্তু ক্যাম্প ও উপনিবেশ ঘুরে ঘুরে তিনি দীর্ঘদিনের প্রয়াসে তথ্য ও গান সংগ্রহ করেছেন। তাঁকে নিছক গবেষক বললে খাটো করা হয়, তিনি প্রেমিক। ৪৫৬ পৃষ্ঠার এই কবিসঙ্গীতের সম্পুট যেন এক মায়াময় ইতিহাস, সজল স্মৃতিভাতুর। বইয়ের পরিশিষ্টে সংকলিত পূর্ববঙ্গের জেলাওয়ারি যে কবিদারদের তালিকা পাচ্ছি তার থেকে দেখা যাচ্ছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল,

ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও খুলনা ছিল কবিদারদের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। এঁদের মধ্যে হরি আচার্য ছিলেন শ্রদ্ধেয়তম। রাজেন সরকার, নকুলেশ্বর, রমেশ শীল এ বঙ্গেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। রমেশের যোগ ছিল প্রগতি আন্দোলনেও। লেখক দীনেশচন্দ্র তাঁর নিজস্ব উদ্যমে পর্ববঙ্গের কবিদারদের জীবন ও গান সংগ্রহ করে বিস্মৃতিপ্রবণ বাঙালির বদনাম কিছুটা স্খালন করলেন। এ-গানের সঙ্গীত রূপ ও স্বরলিপি রক্ষিত হলে কাজটা সম্পূর্ণাঙ্গ হবে। সে কাজের ভার দীনেশচন্দ্রকেই নিতে হবে।

**বারোমাসী গান ও অন্যান্য** — অদ্বৈত মল্লবর্মণ / দেবীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত / প্রণীতা প্রকাশনী, কলকাতা - ৯ / ২৫ টাকা

**উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতে ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা** — বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / গ্রন্থমন্দির প্রকাশন, কলকাতা - ৯ / ৬০ টাকা

**পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত** — দীনেশচন্দ্র সিংহ / পরিবেশনা — দে বুক স্টোর, কলকাতা - ৭৩ / ৫০ টাকা

## গল্প — গ্রাম, ভূত, গোয়েন্দা বিষয়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক

**অধীর ঘটক**

বাংলা শিশু সাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর স্থান সর্বাগ্রে। প্রতিটি শিশু, কিশোর-কিশোরী এই রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠে আনন্দ পায়, তাদের বই পড়ায় নেশা আনে এবং কল্পনায় নিজেরাই এক একটি চরিত্রে রূপ নেয়। গত দুই দশকে রচিত সত্যজিৎ রায়ের লেখা গোয়েন্দা কাহিনীগুলো প্রতিটি পাঠককে আকর্ষণ করে। শিশুসাহিত্যজগতে যেসব লেখক প্রতিষ্ঠা পেতে চান তাঁরা প্রথমেই রচনা করেন গোয়েন্দা গল্প।

আশরফ চৌধুরীর 'গোয়েন্দা ভুলুমামা ও আবু' গ্রন্থটি শিশুদের মনে দাগ কাটার মতো ঘটনায় টান টান। গল্পের নামকরণে গোয়েন্দা ভুলুমামার কথা থাকলেও আসল চরিত্র হলো গোয়েন্দা আবু। বয়স কম, কিন্তু বুদ্ধিটি সরস। অভিভাবকেরা বরাবরই খুঁতখুঁতে। তাঁদের চোখ রাঙানির ভয়ে শিশুদের কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশেই আঘাত পায়। অজানাকে জানার আগ্রহ, রহস্য উন্মোচনের উৎসাহ তথা অনুসন্ধিৎসা এবং প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের আনন্দ সব শিশুকেই উন্মনা করে রাখে। আমাদের দেশের সমাজব্যবস্থায় যা হয়, সাধারণত যা হয়ে থাকে, সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়েছে এই কাহিনীতে। বরং যা হতে পারত, অন্তত কাম্য ছিল, সেই কাল্পনিক বাস্তবতার ভিত্তিমূলে নির্মিত হয়েছে এই গ্রন্থের পরিকাঠামো।

কাহিনীর নায়ক আবু এক বিয়ে বাড়িতে হারিয়ে যাওয়া নেকলেস উদ্ধার করে কীভাবে সবাইকে চমকে দিল তারই ইতিবৃত্ত জুড়ে আছে সমগ্র গ্রন্থে। এ ব্যাপারে তার ভুলুমামার অবদান অসামান্য। দুবরাজপুরের নীলুমাসির বাড়িতে বিয়ের ঠিক আগের দিন হারিয়ে যাওয়া নেকলেস সন্ধানে আবুর তৎপরতায় এবং উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রতিটি পাঠক মুগ্ধ হবে।

শিশুসাহিত্য রচনায় অনিল ঘড়াই একটি নতুন নাম যদিও ইতিপূর্বে তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস সুধী পাঠকসমাজের সমীহ আদায় করে নিয়েছে। তিনি শিশুদের জন্য লেখাতেও সিদ্ধহস্ত, তাদের মনের মতো মানুষ, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'লালি দুলি' শ্রীঘড়াইয়ের এযাবৎ প্রকাশিত ছোটদের গল্পের এক সংকলন। বুদ্ধিদীপ্ত আর রুদ্ধশ্বাস ঘটনায় ভরা সাতটি গল্প স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। গল্পগুলো শুধু শিশুদের নয়, বয়স্ক পাঠকদেরও সমভাবে আনন্দ দেবে।

গহীন অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে বুনো হাতির দল নেমে আসে পাহাড়তলীর গ্রামগুলোতে। দুজন কিশোরের অদম্য বনবাস যাত্রা সেইসব দাঁতালো বুনো হাতির বিরুদ্ধে। দুটি ছাগলকে কেন্দ্র করে গভীর সংবেদনশীল মানবিক গল্প 'লালি দুলি'। একটি হরিয়াল পাখি আর তুলোরানী বেড়ালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মামাবাবুর মুখোশ ঝরে পড়ার মর্মান্তিক কাহিনী 'পাখির নাম হরিয়াল'। চটৈদা রামছাগলের পিঠে চাপেন, কুকুরের পিঠে চেপে নদী পার হন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে কী ফ্যাসাদে পড়লেন তারই মজাদার বিবরণ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে 'চটৈদার ঘোড়ায় চড়া' গল্পে। 'কাঁচের গুলির বাহাদুরী'তে বাহাদুর কিশোর পবনের অসীম সাহসিকতার উল্লেখ আছে যা কল্পকাহিনী নয়, একেবারে মধুর বাস্তব। অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'শালিখ পাখির ডিম' এবং নীলকণ্ঠ ডাক্তারের রাক্ষস ঘোড়ার গল্প পড়তে ভাল লাগবে।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিটি গল্পে আছে গ্রামীণ পটভূমিতে সবুজের গন্ধমাখা, পাতিহাঁসের গুগ্‌লি ভেঙে খাওয়া প্রভৃতি অকৃত্রিম গ্রামের নাড়ির স্পন্দন। আর আছে গ্রাম্য কিশোরদের সশব্দ পদচারণা, জমজমাট ও রুদ্ধশ্বাস অনুভূতিমালার অসামান্য রূপায়ণ।

নয়টি ছোটগল্পের সংকলন পূর্ণেন্দু ঘোষের 'রাখাল বন্দনা' এক অভিনব সংযোজন। গ্রাম্য পরিবেশের অতিবাস্তব তথা নগ্ন জীবনের প্রতিটি ছবি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।



কালিকামঙ্গল, ঘুঘুডাঙ্গা, রাখাল বন্দনা প্রভৃতি গল্পে পাঠক খুঁজে পাবেন গ্রাম্য সমাজজীবনের অতি পরিচিত চিত্র। শ্রীঘোষের বলিষ্ঠ ভাষার জোরে এবং আঞ্চলিক কথোপকথনের উপস্থাপনায় প্রত্যেকটি গল্পই অনবদ্য হয়ে উঠেছে। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা মুস্কিল।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের 'এবং ভূত' গ্রন্থের গল্পগুলোকে এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও বলা যেতে পারে। আধুনিক স্যাটেলাইটের যুগে, বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর শিশুজীবন থেকে ভূতেরা নির্বাসিত। তবুও 'ভূত' শব্দটির মধ্যে আছে শিহরণ, যা প্রতিটি শিশুমনকেই আকর্ষণ করে। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলো সেই অর্থে শিশুপাঠককে আকর্ষণ করবে। হাজুকাকুর চরিত্রটি লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি, যিনি অত্যন্ত নাটকীয় রোমাঞ্চ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোটদের হাজুদাদু হয়ে সরাসরি গল্পের আসরে উপস্থিত হয়ে পাঠককে মাতিয়ে তোলেন। তার আকর্ষণে এসে যায় শ্রীনাথ বহুরূপীও। তবে শহুরে ভূত, লেবু ভূত, দাম ভূত, খোনা ভূত, ঠ্যাঙারে ভূত প্রভৃতি গল্পে লেখক নিজের 'আমিত্ব' অত্যধিক জাহির করেছেন।

শচীন সরকারের 'স্বর্গ সমাচার' গ্রন্থটি একটি মনোরম ব্যঙ্গ কাহিনী, কল্পিত সব দৈব চরিত্রের অবতারণার মাধ্যমে লেখক আধুনিক জীবনের নানা উপকরণ প্রয়োগ করেছেন। যেমন ধর্মরাজ যম স্বয়ং 'গান মেটাল নির্মিত' যমদণ্ডসহ উপস্থিত। সমগ্র গ্রন্থটি সাধুভাষায় লিখিত এবং পাঠককে পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদায় সতর্কভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। গল্পপাঠের স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্বচ্ছতা এ গ্রন্থে অনুপস্থিত। আধুনিক স্বাভাবিক জীবনে মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় আত্মসমর্পণ করতে ব্যস্ত সেক্ষেত্রে এই তৎসম শব্দবহুল গল্পে পাঠক কতটা ডুব দিতে সাহস করবেন তা সন্দেহের ব্যাপার। লেখকের মূল উদ্দেশ্য যদি পাঠক মনোরঞ্জন করা হয় তবে সেক্ষেত্রে 'স্বর্গ সমাচার' ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হবে।

**গোয়েন্দা ভুলুমামা ও আবু** — আশরফ চৌধুরী / চারুবাক, ইউ - ৬২, এস. এইচ রোড, কলকাতা - ১৮ / ১৮ টাকা

**লালি-দুলি** — অনিল ঘড়াই / অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর / ১৮ টাকা

**রাখাল বন্দনা** — পূর্ণেন্দু ঘোষ / পাণ্ডুলিপি, ৬৬ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩ / ২৫ টাকা।

**এবং ভূত** — অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য / দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩ / ৪০ টাকা

**স্বর্গ সমাচার** — শচীন সরকার / চারুবাক, কলকাতা - ১৮/ ২০ টাকা

## চারখানি কবিতার বই

**সজল বন্দ্যোপাধ্যায়**

দেবী রায় বাংলাকবিতার পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহে পরিচিত নাম। দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন দেবী। তাঁর নিজস্ব একটি কাব্যজগত গড়ে উঠেছে এবং অংশত নিজস্ব উচ্চারণভঙ্গিও। ভারতবর্ষ, তোমায় খুঁজছে — কাব্যগ্রন্থে মোট ৫৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। দেশজুড়ে যে অন্ধকারের রাজত্ব — তারই স্বরূপ সন্ধানের ভাবনা প্রায় অধিকাংশ কবিতায় বিধৃত হয়েছে। কখন বিষাদ কখনও চাপা বিদ্রূপ, কখনও হাল্‌কা ব্যঙ্গ, কখনও বা সাদামাটা বিবৃতিতে দেবীর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ''সেলাম'' কবিতায় দেবী যখন লেখেন 'সেলাম তাদেরও যাদের নির্দেশে যখন-তখন ভোজ্য তেল / হাওয়া হয়ে যায় / খরা ও বন্যায়' — তখন মনে হয় কত সহজে দেবী আমাদের সবার কথা বলে দেন। প্রসঙ্গত সমানভাবে স্মরণীয় — 'পুণ্যকে, পাপকে', 'মহাসত্য', 'অহিংসা', ইত্যাদি কবিতাগুলি। জানিনা, দেবী কবিতার পরিমার্জনে বিশ্বাসী কিনা, তবুও কোথাও কোথাও (যদিও মাত্র দু'একটি স্থানে) শব্দব্যবহার বাক্যবিন্যাসে অযথা বিপর্যাস, যেন তাঁর কম সতর্কতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারটা বড় নয়, দেবীর কবিতা আমাদের জাগিয়ে রাখে এবং বিশ্বাস করি, জাগিয়ে রাখবেও।

বিমান মাজি-র ''করাঙ্গুলি নিষিদ্ধ টিলায়'' কাব্যগ্রন্থে মোট ২৪টি কবিতা রয়েছে। দেবী ও বিমানের কবিতা পড়ে লক্ষ করা গেল বিষয়গত সাদৃশ্য অথচ স্বরূপগত বৈসাদৃশ্য। বিমানও দেশকে দেখছেন, তবে তা যেন মূলত আবহমান কালের দেশ। ফলে তাঁর কবিতায় পৌরাণিক প্রসঙ্গ, নাম বারবার উচ্চারিত হয় দেবীর কবিতা যেখানে প্রত্যক্ষ ও তীব্র, বিমানের কবিতা সেখানে প্রচ্ছন্ন ও বিষণ্ন। বিমানের রচনাভঙ্গি অনেকটা প্রথানুগ। তিনি অনায়াসে এখনও 'ত্রিপদী' লেখেন। অবশ্যই স্বীকার্য যে, এতে বিমানের কাব্যকৃতিকে ছোট করে দেখাতে চাইছি না। 'পার্বতী ও পরমেশ্বর', 'ভিক্ষিরী ও বামুন', 'স্বর্গীয় পিতার কাছে পত্র' ছেঁড়াপুথির পাতা,' 'অজ্ঞাতবাসে যাই' — কবিতাগুলি আমায় অবশ্যই আবিষ্ট করেছে।

ঈশ্বর ত্রিপাঠীর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। তাঁর বহু লেখাই আমাকে স্পর্শ করেছে। তাঁর ''রূপসায়র'' কাব্যগ্রন্থে অনেকগুলি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। গ্রন্থটির ১০টি ভাগ রয়েছে, প্রতিটির স্বতন্ত্র নামও রয়েছে — (১) রূপসায়র (২) দ্বা সুপর্ণা (৩) পরাণ সখা (৪) ভালোবেসে সখী (৫) মৃতের উত্থান গাথা (৬) রবীন্দ্রনাথ (৭) ভারতবর্ষ (৮) নাস্তি (৯) অন্যকবিতা

(১০) সক্রেটিস। এটি তাঁর নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থ নয়, কেননা তা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রশ্ন জাগে, এটি কি ১০টি কাব্যপুস্তিকার সম্মিলিত সংকলন ? নাকি প্রতিটি বিভাগে রয়েছে বিশেষ ভাবনাকেন্দ্রিক কবিতাগুচ্ছ ? আমি কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না। "কবি", "ইচ্ছে", "দশ" (মৃতের উত্থানগাথা), "পাপচক্র", "ট্যুরিস্ট লজ", "বালুঘাট সম্মেলন," "মৎস্যহাটা"-ইত্যাদি কবিতাগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছে। তবে শেষে সবিনয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, স্পষ্ট কোনও কাব্যজগৎ এবং একান্ত নিজস্ব বলার ভঙ্গির সন্ধানে ঈশ্বর বোধহয় সচেতনভাবে প্রয়াসী নন। দীর্ঘদিন ধরে যিনি লিখছেন, ঐ প্রয়াস কিন্তু তাঁর কাছ থেকে অবশ্যপ্রত্যাশিত। আর একটা কথা — বইয়ের একটা সূচিপত্র দিলে বোধহয় ভাল হত।

সত্তরের (?) কবি শংকর ব্রহ্মের কবিতার সঙ্গে আমার মোটামুটি পরিচয় আছে। অস্তিত্বের যন্ত্রণা, প্রেম, অপ্রেম, সামাজিক বৈষম্য এই সব ভাবনা শংকরকে আলোড়িত করে কবিতা লেখায়। 'যাব বলে এখানে আসিনি' কাব্যগ্রন্থে মোট ৪৩টি কবিতা রয়েছে। 'গোপনে বা উচ্চারণে' তিনি কবিতার শব্দমালা সাজিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন, এখন কবিতার শব্দগুলি উঠে আসুক বুলেটের মতো। এই গ্রন্থে শংকরের লেখা অনেকগুলি কবিতা আমার ভাল লেগেছে। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যুক্তিবিন্যাসের প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও, পরোক্ষ ক্ষীণ ভূমিকা একটা আছেই। সেদিক থেকে শংকরের কবিতায় বেশ কিছু শব্দ ও পংক্তি আমাকে অতৃপ্ত করেছে। শংকর লিখছেন, "গোপনে বা উচ্চারণে কবিতার শব্দমালা নীরবে সাজানো।" 'নীরবে' শব্দটির কি কোন দরকার ছিল ? কিংবা তিনি যখন বলেন, "ভালোবাসা / তুমি আমাকে ভিখিরি করেছো" — তখন ঐ চরণটি কি সত্যি বহুব্যবহৃত, জীর্ণ চরণ বলে মনে হয় না ? এই অসতর্কতার ফলে শংকরের বহু কবিতা কবিতা হয়ে ওঠার পথে হোঁচট খেয়েছে। শংকরের কবিতার অনুরাগী পাঠক - আমি। লক্ষ্য রাখব, তিনি কী ভাবে তাঁর এই সব শিথিলতাকে পরিহার করে আরও ভাল কবিতা লেখেন।

**ভারতবর্ষ, তোমায় খুঁজছে** — দেবী রায় / অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ — ডাকবাংলো রোড, মেদিনীপুর / ২৫ টাকা

**করাঙ্গুলি নিষিদ্ধ টিলায়** — বিমান মাজি / প্রথমত প্রকাশন, কলকাতা - ৫৬ / ১০ টাকা

**রূপসায়র**—ঈশ্বর ত্রিপাঠী / নালন্দা প্রকাশনী—স্কুলডাঙ্গা, বাঁকুড়া / ৩০ টাকা

**যাব বলে এখানে আসিনি** — শংকর ব্রহ্ম / প্রতিশব্দ প্রকাশনী— কলকাতা - ৮৭ / ১৫ টাকা



# ইস্পাতপুরীর কাহিনী

## গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়

'মরুৎচুল্লির মায়াপুরী' ইস্পাতনগরী জামশেদপুরকে নিয়ে লেখা মীনাক্ষী ঘোষের উপন্যাস। ১৮ ডিমাই সাইজের ১৪০ পৃষ্টার ঠাসবুনন বই। বইটিকে অনেকে হয়ত উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলতে চাইবেন না, স্টাইলিস্টিকের ছাড়পত্র পায়নি বলে। তাতে কী এসে যায় ? বইটি শিল্পকর্ম হয়েছে কিনা সেইটেই বড় কথা। শিল্পকর্ম অর্থাৎ যা মানুষের মনকে রসস্নিগ্ধ করে তোলে। আমার মনে হয় সেদিক থেকে বইটি সার্থক।

'মরুৎচুল্লির মায়াপুরী'তে জামশেদপুর রক্ত-মাংস-মেদ -মজ্জা নিয়ে উপস্থিত। এ-শহরের নিউক্লিয়াস টাটা স্টিলের ব্লাস্ট ফার্নেস। যাকে নাম দেওয়া হয়েছে মরুৎচুল্লি। এই ব্লাস্ট ফার্নেসই উপন্যাসের ডমিনেটিং চরিত্র — নায়িকা। এর মায়াপুরীতে স্বেদ, শ্রম, ভালবাসা নিয়ে মানুষের জীবন-যন্ত্রণা রক্তপদ্মের মতো ফুটে ওঠে। মীনাক্ষী ঘোষ তার সৌরভ ছেনে এনে আমাদের উপহার দিয়েছেন।

এ কেবল জামশেদপুরের জীবনের চালচিত্র নয়। ভারতবর্ষের যে-কোনও শিল্পনগরীর প্রাণস্পন্দন এখানে ধরা পড়েছে। বিশাল সৃষ্টিশীল কর্মযজ্ঞের উঁচু-স্কেলে-বাঁধা প্রডাক্টিভিটি যেখানে, সেখানেই তলায় তলায় নীচতা, শঠতা আর স্রবারির কুরে-কুরে খাওয়া পরিকাঠামো, তার পাশেই কাজকে ভালবেসে তাকে জীবনসাধনা হিসেবে গ্রহণ করা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে, আপসহীন মনোভাব — এই সব নিয়ে 'মরুৎচুল্লির মায়াপুরী' এক অনন্য-সাধারণ রচনা।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল কথাসাহিত্যে সাধারণত শ্রমিক জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা থাকে ; শ্রমিক-মালিক সংঘাত সংঘর্ষ সেখানে মূল উপজীব্য। মীনাক্ষী ঘোষের রচনা মূলত এন্টারপ্রেনিয়র-কেন্দ্রিক, শিল্প-সংগঠকদের ভূমিকা এখানে উজ্জ্বল। কেউ-কেউ হয়ত বলবেন এখানে টাটা হাউসের জয়গান গাওয়া হয়েছে — ক্যাপিটালিজমের পক্ষে স্তাবকতা। কিন্তু আজ কে না জানে ভারতবর্ষে অমিত শিল্পায়নের অন্যতম অগ্রদূত জামশেদজী নসওয়ানজী টাটা। লেখিকার জীবনবোধ এই শহরের আলো-বাতাস, প্রকৃতি-মানুষকে ঘিরে দানা বেঁধে উঠেছে—এই শহরের জন্মে তাঁর কুকে ভালবাসার রক্তক্ষরণ।

কেউ হয়ত বলবেন — অত্যন্ত নস্টালজিক। তাতে কী ? পুরানো দিনের স্মৃতি কল্পনা ধারার মতো প্রবাহিত আমাদের জীবনে। লেখিকা সেই অন্তঃশীলা ফল্গুকে খুঁয়ে-খুঁয়ে গেছেন মাঝে-মাঝে। ক্লান্তিকর মনে হয়নি কোথাও ; বরং সমস্যা-দূষণের পর্যাবরণে তা অক্সিজেন এনে দিয়েছে।



উপন্যাসটির পাত্রপাত্রীরা প্রায় সবাই টিসকোর অফিসার ও অফিসার-গৃহিণী। নর্দান টাউন ও সার্কিট হাউসের অভিজাত পল্লীতে তাদের বাস। সেই পরিমণ্ডলে কাহিনী-উপকাহিনীর বিন্যাস। নায়ক অর্ক চ্যাটার্জি একজন দক্ষ ব্লাস্ট ফার্নেস ইঞ্জিনিয়ার। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। বাবার কাছ থেকে সে কর্তব্য-নিষ্ঠা ও সৎ জীবন-সংগ্রামের দীক্ষা পেয়েছে। কাজই তার কাছে জীবন-সাধনা। পিয়াসী তার সহধর্মিণী এবং সমমর্মিনীও। একমাত্র সন্তান ছোটকুকে নিয়ে সুখী পরিবার গড়ে উঠেছে জীবন-চর্যার নানান অনুষঙ্গে। সুবিনয় সেন অর্কের কর্মগুরু তার চাকরি জীবনে — হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছেন তাকে—অর্ক তাঁর কাছে ঋণী। সেই সুবিনয় সেন অর্ককে ঈর্ষা করেন যখন অর্কের নেতৃত্বে ব্লাস্ট ফার্নেস মর্ডানইজেশনে টিসকো ভারতবর্ষে এক নম্বর স্থান পেতে চলেছে। তার দক্ষতা ও যোগ্যতার মর্যাদাকে অবমূল্যায়ন করতে তিনি সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কদর্য ঈর্ষার দগ্ধ মাৎসর্যের আকাশে মাথা চাড়া দেয়। ফলে, চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে হয় অর্ককে। আনুষঙ্গিক ঘটনা — ১৯৮৯ সালের থার্ড মার্চ ট্রাজেডি, রাজীব গান্ধী ইনভিটেশান ন্যাশন্যাল ফুটবল, জে. আর. ডি.-র ভারতরত্ন সম্বর্ধনা — এই সবের মধ্যে দিয়ে নিপুণ শৈলীতে জামশেদপুরের নাগরিক জীবনের চালচিত্র।

জামশেদপুরে মর্মসভা, সাহিত্যের আসর ও সঙ্গীত চর্চার যে cross - section এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাও প্রতিনিধিত্ব - মূলক। দিল্লীর ভুবন-বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী খাঁ সাহেব এবং সারারাতব্যাপী classical conference, সৎসঙ্গের ভূমানন্দ স্বামী এবং মানবতার উজ্জীবন-ধর্মী অধ্যাত্ম-আলোচনা, ইতালির টেক্‌নিসিয়ান গোটির জিয়েন সাহেব এবং পিয়াসীর সঙ্গে তাঁর বহুতু এমনভাবে পরিবেশন করা হয়েছে যে কোনওখানেই একঘেয়ে মনে হয় নি। লেখিকা আপন মতটিকে বিশ্বাসযোগ্য (convincing) করে তোলার জন্য প্রামাণ্য বই থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু তাও আমাদের কাছে চাপিয়ে-দেওয়া বলে মনে হয়নি। তার কারণ লেখিকার সততা ও আত্মপ্রত্যয়। তাঁর উদ্দেশ্য (objective) ছিল ভারি শিল্প-কেন্দ্রিক শহরে জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে মূল্যমান গড়ে উঠেছে তাকে কাহিনীর মধ্যে তুলে ধরা। সেদিক থেকে তিনি সার্থক।

পিয়াসী-অর্কের জন্ম এই শহরে। এর মাটির প্রতি তাদের নাড়ির টান। বাবা-মায়েদের আমল থেকে রক্তধারায় এই টান তারা ছোটকুদের পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে পেরেছে। তাই এ শহরকে ছেড়ে যেতে তাদের বুকে ভূমিকম্পের মোচড় লাগে। উপসংহারে, বিদায় নেবার সময় টাটানগর স্টেশনে অঝোরে বৃষ্টি—যেন সবাই কাঁদছে। "গার্ডের হুইশেল বাজল, চিৎকার করে বলল কি 'এ টাটাবাবার থান ছেড়ে থাকতে পারবি না বেশীদিন, আবার ফিরে আসতেই হবে'।" আমাদের বুকে তখন কথাগুলো জলতরঙ্গের মতো বাজে।

মীনাক্ষী ঘোষের গদ্য সাবলীল ঝর্ণার মতো প্রাণবন্ত। মাঝে মাঝে কবিতার ইমেজগুলি সেখানে তারার মুক্তোর মতো ছড়ানো। কবি-মন যে নিরঞ্জন ভালবাসার জন্ম দেয় বাক-প্রতিমায় তা ভাস্বর হয়ে ওঠে। 'মরুৎচুল্লির মায়াপুরী' তাঁর কুমারী-কথা (Maiden Speech) উপন্যাস — তাঁর জন্ম - শহরকে ভালবাসার রক্তগোলাপ। জামশেদপুরবাসী হয়ে তাঁকে আমাদের অভিনন্দন।

**মরুৎচুল্লির মায়াপুরী** — মীনাক্ষী ঘোষ — অন্তরঙ্গ প্রকাশনা / ৩২৪ বি, যোধপুর পার্ক, কলকাতা - ৬৮ / ৩০ টাকা / পরিবেশক — দে বুক স্টোর্স, বুকমার্ক।

# অস্তিত্ববাদ এবং রবীন্দ্রনাথ

## সুরজিৎ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বিপুল কর্মকাণ্ড, চিন্তাভাবনা, জীবন ও ব্যক্তিত্বের বহুতর রূপ এবং অনেকান্ত তাৎপর্য অন্বেষণের শেষ নেই। তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা বলা অসম্ভব, কিন্তু তবুও বারবার ফিরে ফিরে নানা দিক থেকে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা চলছেই, চলবেও। এই চেষ্টার একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হল গুণময় মান্নার আলোচ্য গ্রন্থটি। 'লখিনর দিগর' উপন্যাস লিখে পঞ্চাশের দশকে গুণময় মান্না সাড়া তুলেছিলেন, তার পরেও তিনি আরও অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু মনে হয় বিগত বেশ অনেকগুলি বছর ধরে তাঁর অভিনিবেশকে তিনি আবদ্ধ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথের চর্চায়। এই অভিনিবেশের পরিণাম তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্র রচনার দর্শনভূমি'। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৫৫ এবং পৃষ্ঠার পংক্তি সংখ্যা ৩৫ — এই সংখ্যাগুলি থেকে আলোচ্য গ্রন্থ রচনায় লেখক যে কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছেন তা বোঝা যাবে।

আরও নানাবিধ অর্থকর কাজে তিনি এই পরিশ্রম ব্যয় করতে পারতেন, কিন্তু গুণময়বাবু রবীন্দ্রচর্চাতেই এই পরিশ্রম ব্যয় করেছেন এই কথাটা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তারপরে অবশ্য প্রশ্ন ওঠে মোদ্দা ব্যাপারটা কী দাঁড়াল ? গ্রন্থের ভূমিকাতে গুণময়বাবু মনে করিয়ে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ 'লিখতে আরম্ভ

করার দশ বৎসরের মধ্যেই তাঁর দর্শন-ভাবনার মূল প্যাটার্নটি উদ্ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে 'রবীন্দ্র দর্শন' নামে গ্রন্থটিতে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'মোটামুটি বলতে পারা যায়, যাকে সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বলি তা তাঁর মাঝখানে পাই না।' যেটা কৌতূহলোদ্দীপক সেটা এই যে রবীন্দ্রনাথের সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না বলার পরেও হিরন্ময়বাবু কিন্তু রবীন্দ্র-দর্শন বিষয়ক ও নামক গ্রন্থই লিখেছেন। সুধীর নন্দীও লিখেছেন 'রবীন্দ্র-দর্শন অন্বীক্ষণ'। গুণময়বাবু ২৪ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে ২৭ সংখ্যক পৃষ্ঠা পর্যন্ত রবীন্দ্র-দর্শন বিষয়ক পূর্বে প্রকাশিত অনেকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থগুলি হল অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'রবীন্দ্রনাথ', রাধাকৃষ্ণনের 'The Philosophy of Rabindranath', বিজয়গোপাল রায়ের 'The Philosphy of Rabindranath Tagore', আলোক ভট্টাচার্যের 'আধুনিক দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' এবং জগন্নাথ চক্রবর্তীর 'গীতাঞ্জলি : অস্তিত্ববিরহ'। কিন্তু শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পবিত্রকুমার রায় ও নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'রবীন্দ্রদর্শন' গ্রন্থটির নামোল্লেখ করেননি, অথচ অন্তত এইটের নাম বিশেষভাবে করা উচিত ছিল। কারণ এটি প্রকৃতই 'দার্শনিক' গ্রন্থ।

আমি যতদূর জানি, কার্ল ইয়াসপার্স, জাঁ পল সার্ত্র প্রমুখ পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের চিন্তাভাবনার উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার তাৎপর্য অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে প্রথম করেছিলেন। গুণময়বাবু ভূমিকাতে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সন্ধানের জটিল পথে ঘুরতে ঘুরতে সহসাই একদা মনে এসেছিল, 'রবীন্দ্রনাথ এক মানবিক অস্তিত্ব এবং মানব অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন'। তারপর কতকগুলি বাক্যের পরে আবার লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের মতো মানবাস্তিত্বের এমন সামগ্রিক রূপকার আর ক'জন আছেন। তাই দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ মূলত সেই এক অস্তিত্বসাধক হয়েও তিনি হিতবাদী ধ্রুববাদী সহজবাদী বিশ্বাত্মাবাদী গতিবাদী উজ্জীবনবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। এইখানে কট্টর অস্তিত্ববাদীরা মাথা নাড়বেন : অস্তিত্ববাদ কি এত সব কিছুই ! জাঁ পল সার্ত্রে একবার অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন, the word is now so loosely applied to so many things that it no longer means anything at all. (Existentialism Is a Humanism) কিন্তু বর্তমান লেখক নাচার। যেমন কোনও অস্তিত্ববাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী কিনা, তাতে যেমন অস্তিত্ববাদের কিছু যায় আসে না, তেমনি অস্তিত্বসাধক রবীন্দ্রনাথ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব চৈতন্যের প্রকাশতার এতটুকু ব্যাঘাত ঘটেনি। আর পাঠক এইটুকু মনে রাখবেন, এই গ্রন্থে যথাযথ অস্তিত্ববাদের আলোচনা নিছক প্রাসঙ্গিক, আমাদের প্রয়াস রাবীন্দ্রিক অস্তিত্ববাদের উদ্ঘাটনের লক্ষ্যাভিমুখিন। গত দশ বৎসর ধরে রাবীন্দ্রিক অস্তিত্বদর্শনের সেই রূপ-রচনার সাধ্যমতো প্রয়াস পেয়েছি, তারই ফল এই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ।' উদ্ধৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এটুকু লেখকের জবানিতে না জানালে আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বোঝানো কঠিন হত এবং আমি যা অনেক কষ্ট করে বোঝাতাম তা হয়ত লেখকের প্রকৃত বিষয়বস্তু হত না, হত আমার মন গড়া অন্য কোনও বিষয়বস্তু। লেখকের বক্তব্য অবিকৃত রাখার জন্যে 'বক্ষ্যমাণ' শব্দটির পরিবর্তে 'বর্তমান' শব্দটিও বসাইনি।

'রাবীন্দ্রিক অস্তিত্বদর্শনে'র পরিচয় দিতে গিয়ে গুণময়বাবু ভূমিকাতেই সার্ত্রের একটা উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে মনে হয় যে অস্তিত্ববাদ আজকাল এত রকম জিনিস বোঝায় যে অস্তিত্ববাদ ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে গেছে। গুণময়বাবুর দেওয়া উদ্ধৃতির পাশে ওয়ালটার কাউফমানের Existentialism from Dostoevsky to Sartre রচনাটির প্রথম কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি : Existentialism is not a philosophy but a label for several widely different revolts against traditional philosophy. Most of the living "existentialists" have repudiated this label, and a bewildered outsider might well conclude that the only thing they have in common is a marked aversion for each other. আবার Journey through Dread এর লেখক আরল্যান্ড আশার বলেছেন, Existentialism is a philosophy for thought adventurers, as our title implies — a way of thinking for an age of experiment, tension and stress. এবং মার্কিন মনীষী উইলিয়াম ব্যারেট Irrational Man : A Study in Existential Philosophy-তে লিখেছেন, Kierkegaard set himself the task of determining whether Christianity can still be lived or whether a civilization still nominally Christian must finally confess spiritual bankruptcy ;. . . Nietzsche begins with the confession of bankruptcy : God is dead, . . . ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে অস্তিত্ববাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক দেউলেদশার ও তার জন্যে উৎকণ্ঠার একটা গভীর সম্পর্ক আছে। সার্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম Being and Nothingness অর্থাৎ 'হওয়া আর শূন্যতা'। এখানে গুণময়বাবুর কাছে একটা প্রশ্ন আছে : অস্তিত্ববাদের অন্তর্গত 'অস্তিত্ব' শব্দটার অর্থ কী ? 'থাকা', না 'হওয়া' ? নাকি 'থাকা' আর 'হওয়া' সমার্থক ? লন্ডনের মেথুয়েন অ্যান্ড কোং প্রকাশিত Extentialism and Humanism গ্রন্থে অস্তিত্ববাদের অর্থ বোঝাতে গিয়ে সার্ত্র লিখেছেন যে এটা এমন একটা মতবাদ which affirms that every truth and every action imply both an environment and human





subjectivity. গুণময়বাবুর বিশাল গ্রন্থ পড়ে আমার মনে হয়েছে যে অস্তিত্ব বলতে তিনি সোজা বাংলায় যাকে 'থাকা' বলে তাই বুঝিয়েছেন, যেমন ঘরবাড়ি আসবাবপত্র কুকুর বিড়াল ইত্যাদি থাকে। তিনি অবশ্য কুকুর বিড়ালের অস্তিত্ব থেকে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বকে পৃথক করে লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ এক মানবিক অস্তিত্ব এবং মানব অস্তিত্ব সম্বন্ধেই তিনি লিখেছেন', কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য থেকে 'অস্তিত্ব'-র কোনও গূঢ় অর্থ উদ্ভিন্ন হল কি ? দর্শনের আলোচনায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ পরিষ্কার হওয়া উচিত নয় কি?

গুণময়বাবু প্রবেশক অংশেই লিখেছেন, 'রবীন্দ্রদর্শনের উন্মেষপর্ব হচ্ছে অস্তিত্ববাদ। রবীন্দ্রচেতনার উন্মেষক্ষণ থেকে শুরু করে পরিণততম বিন্দুটি পর্যন্ত যে দর্শন মূল প্রবর্তনা রূপে কাজ করেছে এবং সৃজ্যমান বিকাশের পথে নানা বিচিত্র দর্শনকে আত্মসাৎ করেছে, এই গ্রন্থে তার নাম দেওয়া হয়েছে অস্তিত্ববাদ, একজিসটেনসিয়ালিজম। কথাটিকে সত্তাদর্শনও বলা হয়; যদিও অস্তিত্ব ও সত্তা কথাদুটির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। অস্তিত্ব মূর্ত এবং সত্তা তারই ভাব-সারতা-দ্যোতক।' এই সব মন্তব্যই বড় অস্পষ্ট। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে একজিসটেনসিয়ালজম, ফেনোমেনোলজি প্রভৃতি কথার দ্যোতনা ও সীমানা যতখানি নির্ধারিত হয়েছে বাংলায় ততখানি হয়নি, ফলে অর্থের বিভ্রাট ও প্রয়োগের বিভ্রান্তি অনিবার্য।

কথার ঝোঁকে কথা বলে যাওয়ার দৃষ্টান্ত গ্রন্থের প্রথমাংশ থেকেই দিচ্ছি। পাছে গ্রন্থকার ও তাঁর ভক্তবৃন্দ মনে করেন যে আমি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিমটি কেটে উদ্ধৃতি দিচ্ছি তাই আবার একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি : 'সেই হেগেলীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়াতেই উদ্ভূত হয়েছিল অস্তিত্ববাদ — অস্তিত্ববাদ এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইয়েসপার্স, সেই জার্মান দেশেরই দার্শনিক। আবার হেগেলীয় পরমবাদ যেসব ধনতান্ত্রিক ভূমি থেকে উৎসারিত, তার প্রতিবাদী অস্তিত্ববাদও সেই একই ভূমিজাত। ধনতন্ত্রের ভূমিই অস্তিত্ববাদের উৎপাদক। এখন রবীন্দ্রনাথের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যাক। ইংরেজি ধনতন্ত্রের সহযোগী হয়ে ভারতীয় ধনতন্ত্রের যত খণ্ডিত ও দুর্বল প্রকাশ ঘটুক না কেন, দুটো সগোত্র ত বটে। অনুকূল মৃত্তিকায় উপযুক্ত জলহাওয়ার সহায়তায় একই ধরনের বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয়, তেমনই উনিশ শতকের শেষ দিকে ধনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে লালিত রবীন্দ্রনাথ যে স্বাধীনভাবে অস্তিত্ববাদ উদ্ভাবন করবেন তাতে আশ্চর্য কী। পাশ্চাত্য দর্শনচিন্তার কথা আলোচিত হল। ভারতীয় ঐতিহ্যে অস্তিত্ববাদের কোনো নজির ছিল কি ? মনে হয় ছিল। উপনিষদে যেমন এ্যাবসলিউট বা পরম ব্রহ্মের ধারণা আছে (ওটাই কিন্তু পৃথিবীর চিন্তাজগতে প্রথম পরমের ধারণা), তেমনি সত্তার ধারণাও ওখানে উপস্থাপিত — আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, সোহহং প্রভৃতি বাক্যে সত্তা ও পরমের সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে।' এবার কয়েকটি প্রশ্ন। ইয়াসপার্স কোন দেশের ? জার্মানির না ডেনমার্কের ? ধনতন্ত্রের ভূমিই যদি অস্তিত্ববাদ উৎপাদন করে তাহলে ভারতীয় ঐতিহ্যে অস্তিত্ববাদের নজির কী করে সম্ভব ? তাছাড়া পরম ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে অস্তিত্ববাদের সম্পর্ক কী ? প্রকৃতপক্ষে 'থাকা' অর্থে 'অস্তিত্ব' শব্দটি প্রয়োগ করলে অস্তিত্ববাদের কোনও দার্শনিক তাৎপর্য থাকে কি ? গ্রন্থকার ব্যবহৃত 'পরম ধারণা'র অর্থই বা কী ? 'পরম' বলতে উপনিষদে 'আত্মা', ফিখটের দর্শনে 'অহং', হেগেলের কাছে 'বিশ্বজনীন সূত্র' শোপেনহাওয়েরের কাছে 'ইচ্ছা' (এই 'ইচ্ছা'র সঙ্গে ঐতরেয়োপনিষদের 'ঈক্ষণে'র সম্পর্ক আছে কি) এবং বের্গসঁর দর্শনে 'উপলব্ধি' বোঝায় নাকি ? গুণময়বাবু কোন্ 'পরম ধারণার' কথা বলতে ইচ্ছা করেছেন ? দার্শনিক অর্থে অস্তিত্ববাদ কথাটি বা existentialism কথাটি ইয়াসপার্স না এফ্. হাইনেমান প্রথম প্রয়োগ করেন ? রবীন্দ্রনাথ 'স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ববাদ উদ্ভাবন' করেছিলেন কথাটির অর্থ কী ? সত্যিই যদি রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনভাবে কোনও দার্শনিক চিন্তা-ব্যবস্থা 'উদ্ভাবন' করে থাকেন এবং সেই ব্যবস্থার সঙ্গে যদি আধুনিক পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদের কোনও কোনও সদৃশতা আমাদের চোখে পড়ে তাহলে কি আমরা সেই সদৃশতাগুলিকে 'অস্তিত্ববাদ' বলে চিহ্নিত করতে পারি ?

অবশ্য গ্রন্থকার প্রবেশক অংশে লিখেছেন, 'রবীন্দ্র রচনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়াল যে পর্যায় বোঝাতে ভূমিসূচক অস্তিত্ববাদ হিতবাদ ধ্রুববাদ ভক্তিবাদ প্রমুখ কথাগুলি আমরা ব্যবহার করব, কিন্তু বুঝব, রাবীন্দ্রিক অস্তিত্ববাদ, রাবীন্দ্রিক হিতবাদ, রাবীন্দ্রিক ধ্রুববাদ, রাবীন্দ্রিক ভক্তিবাদ প্রভৃতি। আর সমগ্র বোঝাতে রবীন্দ্রদর্শন কথাটা তো রইলই।' মনে হয় এসবই কথার মারপ্যাঁচ — পাণ্ডিত্যের চমকপ্রদ প্রচ্ছদে পাঠককে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা। কারণ পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসঙ্গে ইউট্যালিটেরিয়ানিজম, পজিটিভিজম ইত্যাদি কথা দিয়ে আমরা বিশেষ বিশেষ চিন্তা প্রক্রিয়াকে বোঝাই। রবীন্দ্রনাথ কি বঙ্কিমচন্দ্রের মত কোঁৎ, বেন্থাম, মিল প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনাবলি পড়ে তাঁদের চিন্তাধারা দিয়ে নিজেকে প্রভাবিত হতে দিয়েছিলেন ? কৌতূহলের বশে রবীন্দ্রনাথ এঁদের অনেকের লেখা পড়েছিলেন, কিন্তু রচনাবলি পাঠ বা চর্চা এক কথা আর সেই রচনাবলির প্রভাবে নিজের এক চিন্তা-পক্রিয়া গড়ে তোলা, তার প্রস্তাব রচনা করা ও সেই প্রস্তাবের প্রচার করা অন্য কথা। যদি রবীন্দ্রনাথ ইউট্যালিটেরিয়ানজম বা পজিটিভিজম বা একজিসটেনসিয়ালিজম দর্শন অধ্যায়ন করে এই সব দর্শনের ভিত্তিতে নিজস্ব কোনও দার্শনিক চিন্তা প্রক্রিয়া গড়ে তুলতেন তাহলে তাকে রাবীন্দ্রিক হিতবাদ বা রাবীন্দ্রিক ধ্রুববাদ বা রাবীন্দ্রিক অস্তিত্ববাদ বলে চিহ্নিত করার কোনও যুক্তি থাকত।

সেরকম কিছু যখন হয়ইনি তখন রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমিকে হিতবাদ ধ্রুববাদ ইত্যাদি অভিধা দেওয়ার সার্থকতা কী ?

এইভাবে অধ্যায় ভাগ করার তবু খানিকটা সার্থকতা থাকত যদি দেখতাম যে বেহাম-মিল প্রমুখের ইউট্যালিটেরিয়ানিজমের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ইউট্যালিটেরিয়ানজমের কোথায় কোথায় সদৃশতা আছে সেগুলি গ্রন্থকার নিরূপণ করে এই সাদৃশ্যগুলির তুলনামূলক বিচার করেছেন এবং তারপরে ঐ বিচারের ভিত্তিতে রাবীন্দ্রিক হিতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষের জন্যে সবচেয়ে অধিক পরিমাণ সুখের তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রেরও একটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ঐ আপাত সাদৃশ্যের জন্যে বেহামের সঙ্গে মার্কসের তুলনা কি কোনও সুস্থবুদ্ধি দর্শন-ছাত্রের পক্ষে করা সম্ভব ? কেউ কি মার্কসীয় ইউট্যালিটেরিয়ানিজমের কথা শুনেছেন ? তাহলে রাবীন্দ্রিক হিতবাদ অথবা রাবীন্দ্রিক ধ্রুববাদ কিংবা রাবীন্দ্রিক অস্তিত্ববাদ প্রভৃতি কথার অর্থ কী ?

ঔপন্যাসিক গুণময় মান্না রবীন্দ্রনাথের জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন ভাসা-ভাসা ভাবে পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়নের প্রাথমিক উত্তেজনার বশে। গ্রন্থটির বিষয়সূচি কৌতূহলোদ্দীপক : 'প্রথম অধ্যায়। প্রবেশক ; দ্বিতীয় অধ্যায়। অস্তিত্ববাদ : সূচনা ; তৃতীয় অধ্যায়। হিতবাদ ; চতুর্থ অধ্যায়। ধ্রুববাদ-১; পঞ্চম অধ্যায়। ধ্রুববাদ-২ ; ষষ্ঠ অধ্যায়। সহজবাদ ; সপ্তম অধ্যায়। বিশ্বাত্মবাদ গতিবাদ উজ্জীবনবাদ ; অষ্টম অধ্যায়। অস্তিত্ববাদ : পূর্ণতা'। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-শিল্পকে তিনি মোট সাতটি 'বাদ' দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু কার্যত রবীন্দ্র জীবন ও শিল্প-সাহিত্যের এক এক পর্বের গায়ে এক এক 'বাদের' label সেঁটে দিয়েছেন মাত্র। উজ্জীবনবাদের মধ্যে গান্ধীবাদ আছে কিন্তু বিপ্লববাদ নেই, আছে বিপ্লবপন্থা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তিনি লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সত্যসন্ধ, সুতরাং বিপ্লববাদের মূল প্রবর্তনাকে যেমন তিনি মান্য করেন, তেমনি তার ভ্রান্ত প্রয়োগকে পরিহার করেন — এর মধ্যে বৈপরীত্য থাকতে পারে, কিন্তু অসামঞ্জস্য নেই।' এখানে অবশ্য বৈপরীত্য' এবং 'অসামঞ্জস্য' শব্দ দুটির প্রয়োগ নিয়ে খটকা আছে কিন্তু মোটের উপর বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত রকম 'বাদ' থেকে পৃথক করে অচিহ্নিত রবীন্দ্রনাথ রূপে দেখলেই বোধহয় ভাল হয়। আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য অনেক অসামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সেগুলি সত্যিই বৈপরীত্য বা অসামঞ্জস্য না এক মহাদেশের বিপুল বৈচিত্র্য তা বলা খুব সহজ নয়। 'অস্তিত্ববাদ : পূর্ণতা' শীর্ষক অংশের শুরুতেই গুণময়বাবু বলেছেন, 'রবীন্দ্র দর্শনের এই অন্তিম পর্বের তাবৎ রচনায় রবীন্দ্রনাথ উক্ত দুটো দিকেই দৃষ্টিপাত করেছেন — ক. মহাবিশ্বের প্রতি উন্মুখতা, এবং খ. অন্তর্বিশ্বের প্রতি সামী দৃষ্টিপাত।' এই প্রসঙ্গে তিনি যে 'খাপছাড়া'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত চতুর্মুখ বিধির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এটা লক্ষণীয়।

গুণময়বাবু ৫৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বিশাল রচনার প্রচ্ছদে 'রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি' বলে একটা নাম লিখে দিয়ে যাই বোঝাবার চেষ্টা করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এবং বস্তুতলেই তাঁর বক্তব্য ও মন্তব্য রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের বিস্ময়কর খণ্ডে চকিতে আলোকপাত করে। 'পত্রপুটে'র 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'পৃথিবী'র যে-স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তা যেমন বিস্ময় জাগায় রবীন্দ্রনাথের শিল্পও তেমনই বিস্ময় জাগায়। এই বিস্ময়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকৃতির পরিচয় অনুধাবনের জন্যে গুণময়বাবুর প্রয়াস অবশ্যই আগ্রহ সৃষ্টি করে। তাঁর প্রয়াসকে নাটকীয়তা দেওয়ার জন্যে তিনি বহু উপাদান সহযোগে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দৃশ্য রচনা করেছেন।

পরিশেষে বলি সার্ত্র অস্তিত্বকে বলেছেন 'চাবির গর্তে মানুষ'। এর মানে — একজন লোক চাবির গর্তে চোখ লাগিয়ে নিজেকে ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে ভেতরের দৃশ্যাবলি দেখছে ; এমন সময়, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে সে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল নিজের সম্বন্ধে এবং এই সচেতনাই হল 'অস্তিত্ব' — এই সচেতন 'হওয়া'-ই অস্তিত্ববাদীর অস্তিত্ব। এখানে ফিরে এলাম এই আলোচনার শুরুতে অস্তিত্ববাদের যে সংজ্ঞার্থ সার্ত্র দিয়েছেন বলেছি সেই সংজ্ঞার্থে। প্রত্যেক সত্য এবং প্রত্যেক কাজের সঙ্গে পরিপার্শ্ব ও মানবিক চরিত্রবিষয়তার যাথার্থকরণ হল অস্তিত্ববাদ। কিন্তু শুধুমাত্র ঐ যাথার্থকরণের সদৃশ কোন কোন আপাতিক লক্ষণ দেখতে পেলেও প্রাসঙ্গিক শিল্পকৃতিকে অস্তিত্ববাদী বলা যাবে কি ? 'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে,' হে রবীন্দ্রনাথ।

**রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি** — গুণময় মান্না/প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪/ নব্বই টাকা।

## সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি

# একটি অগ্রণী বাঙালি মুসলিম পরিবারের চিন্তা-চেতনার ধারা

কাজী সুফিউর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৬ ॥

আবুল কাশেমের একমাত্র পুত্র আবুল হাশিম তার পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল অথচ বিতর্কিত রাজনীতিবিদ্। তিনি পূর্বাপর পুরুষানুক্রমিক আধা-সমাজসেবা আধা-রাজনীতির চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে পুরোপুরি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন। বাবা-দাদুরা যেখানে ছিলেন প্রচলিত রাজনীতির অনুরাগী, আবুল হাশিম সেখানে শুধু তাত্ত্বিক নেতারূপেই নয়, প্রগতিশীল রূপান্তরকামী সাংগঠনিক মনোভাব নিয়ে বাংলার রাজনীতির অঙ্গনে হাজির হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে পিতা আবুল কাশেম মারা গেলে বর্ধমানের ঐ সংরক্ষিত আসনে আবুল হাশিম নির্দল প্রার্থী রূপে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমান জেলার তদানীন্তন কংগ্রেস দলের প্রভাবশালী নেতা মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনকে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। আবুল হাশিম, অবশ্য, তার এই জয়লাভকে তার পিতার জনপ্রিয়তার এবং মৃত্যুর আবেগজনিত কারণের ফল বলে উড়িয়ে করেন।[৫৫] ১৯৩৭ সালে মুহম্মদ আলী জিন্নার ব্যক্তিগত আহ্বানে লীগে যোগদান করেন তিনি।[৫৬] ১৯৪১ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে তিনি লীগের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে আবুল হাশিম বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। নানা টানাপোড়েনের মধ্যে তার এই জয়কে তিনি 'Miracle' উল্লেখ করেন।[৫৭] এরপর থেকে বাংলার লীগ রাজনীতির নানা পর্যায়ে আবুল হাশিম একদিকে যেমন বলিষ্ঠ জনমত এবং সংগঠন গড়ে তোলেন তেমনি অপরদিকে দলীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন। আবুল হাশিমকে সামগ্রিকভাবে যথাসম্ভব অনুধাবনার্থে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা গেল —

**(ক) হাশিম ও লীগ ঃ** হাশিম সারা বাংলা মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই লীগের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াসী হন। মার্কসবাদী এবং ইসলামিক নীতির সমন্বয় ঘটিয়ে আবুল হাশিম লীগকে ক্যাডারভিত্তিক সংগঠনে পরিণত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধক্লিষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত যুবসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে তিনিই সর্বপ্রথম জেলা ও গ্রামভিত্তিক লীগের সংগঠন গড়ে তুলতে তৎপর হন। শুধু তাই নয় সারাক্ষণের (Full time) লীগ সদস্যদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লীগের তহবিল গঠনে সার্বিক চাঁদা স্থিরীকৃত হয়।[৫৮] এর আগে লীগের ব্যক্তিগত দান ও অনিয়মিত চাঁদা সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৫৯] এককথায়, তিনি লীগকে খাজা-নবাব-বাহাদুরদের মজিল-মহফিল থেকে মুক্ত করে সারা বাংলার সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হবার (৮ নভেঃ ১৯৪৩) পরদিনই তিনি বলেন "মুসলীম লীগ তিন স্থানে বন্ধক রয়েছে, স্যর সলিমুল্লার সময় থেকে নেতৃত্ব বন্ধক আছে আহ্সান মঞ্জিলে, প্রচার বন্ধক আছে দৈনিক আজাদের মালিকের কাছে, আর আর্থিক ভাবে বন্ধক রয়েছে ইস্পাহানীর নিকট। আমি চেষ্টা করব ঐ বন্ধকসমূহ থেকে মুসলিম লীগকে মুক্ত করতে এবং বাংলার মধ্যবিত্তকে তার যোগ্যস্থানে বসাতে।"[৬০] তিনি অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন। তার কাছে মুসলীম লীগ মানেই শুধু মুসলিমদের সংগঠন নয়, এটা ছিল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সম-অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও আত্মপ্রতায়ের দাবীসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।[৬১]

আবুল হাশিমের সংগঠন কৌশল, রাঙ্কানিয়াত তত্ত্ব, লীগ ইস্তাহার, সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর প্রগতিশীল ধ্যানধারণা এবং সর্বোপরি কমিউনিস্টদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা তাকে যেমন মূল লীগের স্রোত থেকে সরিয়ে দিচ্ছিল, ঠিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া রূপে তিনি বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করে প্রবল জনমত ও সমর্থনের সাহায্যে বিরুদ্ধবাদীদের কোণঠাসা করেছিলেন। আবুল হাশিমের সহযোগীরা সেদিন লীগের কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে 'বামপন্থী লীগ' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

**(খ) হাশিম ও ডানপন্থী লীগ ঃ** লীগের ডানপন্থী বলতে বোঝাত ঢাকার খাজাগোষ্ঠী, ইস্পাহানী, অবাঙালি লীগ নেতারা এবং তাদের অনুগামীরা। শহীদ সোহ্রাওয়ার্দি ছিলেন দোদুল্যমান। এককথায় লীগের মধ্যে ডানপন্থীরা নেতৃত্বে

ছিলেন বেশি। ডানপন্থীরা যতটা না ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ততোধিক সাম্প্রদায়িক। বামপন্থীরা এর উল্টো। ডানপন্থীরা ভারত এবং বাংলা দুইই ভাগ চেয়েছিলেন, আবুল হাশিম ভারত ভাগ সমর্থন করেছিলেন তবে বাংলা বিচ্ছেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। বঙ্গবিভাগ, পুঁজিবাদ, লীগ মেনিফেস্টো প্রভৃতি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন ও বিষয়ে আবুল হাশিমের সঙ্গে ডানপন্থীদের বিরোধ চরমে ওঠে। উল্লেখ্য, 'আজাদ', 'মর্নিং নিউজ' 'স্টার' সব সংবাদপত্রই ছিল ডানপন্থীদের কুক্ষিগত। কাজেই ১৯৪৫ সালের ১৬ নভেঃ আবুল হাশিম নিজ সম্পাদনায় 'মিল্লাত' নামে দৈনিক প্রকাশ করেন দলীয় মতামত ও জনমত প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। হাশিমের মতে ডানপন্থীদের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কারণ ইসলাম সম্পর্কিত ধ্যানধারণায় পার্থক্য থাকার দরুন। তার মতে খাজাপন্থীরা হলেন বাগদাদজাত সংস্কারপন্থী, কাজেই কোন বিপ্লবাত্মক প্রক্রিয়া তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সহজ নয়। অপরপক্ষে তিনি নিজেকে সরাসরি মদিনাউদ্ভূত বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনার ধারক-বাহক বলে মনে করতেন।[৬৫] যাইহোক, ১৯৪৩-৪৭ পর্যন্ত সময়ে লীগের মধ্যে বামপন্থী ও ডানপন্থীদের বিরোধ এবং বিরোধজাত বিক্ষোভ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার বিষয়। হাশিম স্বীয় বুদ্ধিবলে দলের মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ালেও লীগের দুটি মন্ত্রীসভাতেই ডানপন্থীদের সংখ্যাতীত প্রাধান্য ছিল।

**(গ) হাশিম ও সোহ্‌রাওয়ার্দি ঃ** সোহ্‌রাওয়ার্দি ছিলেন হাশিমের মাসতুতো শ্যালক। হাশিমের ধারণা সোহ্‌রাওয়ার্দি রাজনীতিতে সুবিধাবাদী। তিনি একস্থানে স্বীকার করেছেন লীগ রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দি বেশির ভাগ সময়ে তার বিরোধিতা করলেও, তার আর্থিক দুরাবস্থার সময় বোনকে সাহায্য করতেন। সোহ্‌রাওয়ার্দি বাঙালি হলেও তার কালচার ছিল উর্দুভাষাভাষীদের কালচারের কাছাকাছি। কাজেই আবুল হাশিমের সঙ্গে সংকৃতিগত বিরোধ তাঁর ছিল। হাশিম ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের কলকাতার দাঙ্গা সমন্ধে মন্তব্য করেন যে সোহ্‌রাওয়ার্দির রাজনীতির ভুল ছিল তবে অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। ১৬ই আগস্ট ছুটি ঘোষণাকে সোহ্‌রাওয়ার্দির রাজনৈতিক ভুল বলে ব্যাখ্যা করেন।[৬৩] তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন ডানপন্থী লীগ নেতাদের ঐ দিনের ময়দানের ভাষণে প্রকাশ্য হিন্দু বিরোধিতার ধারা লক্ষ্য করা যায়। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় সোহ্‌রাওয়ার্দি নিজ জীবন বিপন্ন করে ঘুরেছিলেন। শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গাবাজ সাম্রাজবাদী দালালদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হবার কোন অবকাশ ছিল না, বলে তিনি মনে করেন। বাংলার পুলিশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না বলে সোহ্‌রাওয়ার্দির অনুরোধে পাঞ্জাব সরকার পুলিশ পাঠালে কলকাতা শহর পাঁচদিন পর নিয়ন্ত্রণে আসে। লর্ড ওয়াভেলকে ২৪শে আগস্ট হাশিম বলেন, "কলকাতার খুন, ধর্ষণ, লুঠপাঠ প্রভৃতির জন্য আপনারাই দায়ী"।[৬৪] আবুল হাশিম আরও বলেন, "দাঙ্গা লাগাবার ইচ্ছা থাকলে আমি আমার ৮ বছরের পুত্র শাহাবুদ্দিন এবং লাল মিয়া তার ৬ বছরের পৌত্রকে নিয়ে ময়দানে যেতেন না।"[৬৫]

**(ঘ) হাশিম ও জিন্না ঃ** মুসলিম লীগ গণতান্ত্রিক এবং উদার আদর্শভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান হবে জিন্নার এই আহ্বানে আবুল হাশিম লীগে যোগদান করেন (১৯৩৭)। পরবর্তীকালে তিনি বলেন, "আমি জিন্নার এই প্রবোধে প্রতারিত হয়েছিলাম, কেননা জিন্না-নাইট-নবাব ও পুঁজিবাদী চক্রের বাইরে কখনই ছিলেন না"।[৬৬] ঢাকার খাজাগোষ্ঠী এবং লীগ সভাপতি মৌলানা আকরম খাঁর হাশিম-বিরুদ্ধ নিরন্তর অভিযোগ জিন্নাকে অবগত করা সত্ত্বেও জিন্না কখনই হাশিমের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং তিনি বাংলার লীগের ডান-বাম বিরোধ মেটাতে সাহায্য করেন। আসলে জিন্না চেয়েছিলেন হাশিমের যুব-সচেতনমূলক কাজের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক মঞ্চকে জননেতা ফজলুল হকের প্রভাবমুক্ত করতে।[৬৭]

সেই সময়কার লীগ নেতাদের মধ্যে আবুল হাশিমই একজন যিনি জিন্নার সামনে প্রতিবাদ করার সাহস রাখতেন।[৬৮] ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব হাশিম সমর্থন করলেও তিনি জিন্না প্রস্তাবিত অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন না। স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনার সময় হাশিম ১৯৪০ সালের রেজোল্যুশনে একাধিক রাষ্ট্রের (States) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন জিন্নার উপস্থিতিতে।[৬৯]

জিন্না বয়সে তরুণ আবুল হাশিমের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি সর্বদাই আবুল হাশিমকে "মাওলানা সাহেব" বলে সম্বোধন করতেন।[৭০]

**(ঙ) হাশিম ও কমিউনিজম প্রসঙ্গ ঃ** আবুল হাশিম প্রথম লীগ নেতা যিনি উদারতাবাদ, মার্কসবাদ এবং ইসলামী দর্শনকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর দলকে আভিজাতের মোহ থেকে মুক্ত করে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'ইমপ্রেশন্যাবল্' যুগের যুবকদের মার্কসবাদের প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে, তাই আমি ইসলামের সামাজিক-আর্থিক মৌলবাদগুলি বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলাম।[৭১] সেদিন তার কাছে এর অর্থ ছিল ইসলামের আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা মার্কসবাদের অনুরূপ, কাজেই যুবকরা মার্কসবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে।

এতদসত্ত্বেও বলতে হয় কমিউনিজম এবং বাংলার কমিউনিস্টপন্থীদের প্রতি আবুল হাশিমের দুর্বলতা ছিল। একজন লীগ নেতা হিসাবে তিনি স্বীকার করতেন যেখানে কমিউনিজম মানার মানব আর যেখানে বিরোধিতা করার



দরকার সেখানে বিরোধিতা করব।[৭২] তিনি আরও বলেছেন, "My Catholic approach to politics was constructed by Khwaja Nazimuddin and his group as my weakness for the Communist and the Hindus".[৭৩] যাইহোক, ১৯৪৫-এর পর থেকে আবুল হাশিম খাজা নাজিমউদ্দিন ও তার সম্প্রদায়ের সুস্পষ্ট মতিগতি বুঝতে পেরে কমিউনিস্টদের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও লীগের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা করতে তিনি আগ্রহী ছিলেন ; কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। হাশিমের নির্বাচনী মেনিফেস্টো (১৯৪৬) রচনায় কমিউনিস্ট ' নিখিল চক্রবর্তী প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন।[৭৪] বলাবাহুল্য, ডানপন্থী লীগ নেতারা মেনিফেস্টো কথাটি কমিউনিস্ট 'টারম্' বলে নির্বাচনে আক্রমণ করেন। এই নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার আভাস লক্ষ করা যায়। নির্বাচনের আগে তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পুরণচাঁদ যোশী মুসলিম লীগকে জনগণের আন্তরিক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠন রূপে গড়ে তুলতে আহ্বান জানালে হাশিম সরাসরি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৭৫] স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ বঙ্গভূমি গঠনের আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের সাথে হাশিমের আন্দোলন প্রায় সমান্তরাল হয়ে পড়ে। তিন বর্ধমান জেলায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের সাথে মিলিত হয়ে 'খাদ্য কমিটি' এবং 'বন্যাত্রাণ কমিটির' সম্পাদক মনোনীত হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে থাকেন।[৭৬] বিশেষ করে কমিউনিস্টদের সাথে হাশিমের এই হৃদ্যতা সরকার তথা ডানপন্থী লীগ নেতারা ভাল চোখে দেখেনি। তারা প্রকাশ্যভাবে নানা মন্তব্য শুরু করেন হাশিমকে নিয়ে। দৈনিক আজাদ পত্রিকায় মৌলানা আকরম খাঁ 'হাশিম' নিবন্ধে তাকে 'কমিউনিস্ট' ও 'কাদিয়ানী' বলে চিহ্নিত করেন। লীগনেতা আবদুর সবুর খাঁন হাশিমের সঙ্গে কমিউনিস্টদের গোপন যোগাযোগ এবং হাশিমের বিপ্লবীকরণের প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করেন। খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্য ছিল ইসলামের মোড়কে হাশিম কমিউনিজম প্রচার করে এলাকায় যুবক ক্ষেপান।[৭৭] এইভাবে হাশিমের বিরুদ্ধে নানা ফতোয়া শুরু হয়ে যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে আবুল হাশিম এবং তার থেকে আট বছরের ছোট ভায়ো সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ (বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্পাদক, ১৯৩৫) বর্ধমানের একই বাড়ীতে থাকতেন।[৭৮]

**(চ) হাশিম ও ইসলাম ঃ** কোন কোন রাজনীতিবিদের রাজদর্শন তার নিজস্ব ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে এবং বিশেষ করে যদি ঐ ব্যক্তি ধর্মীয় অথবা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিক্রমও লক্ষ করা যায়। আবুল হাশিম ব্যক্তিগতভাবে গতিশীল ইসলামে বিশ্বাসী ছিলেন যা তিনি মদিনাবাদী ইসলাম দর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তদনুরূপ ধারণা থেকে তিনি এক আল্লাহ্ এবং তাঁর জমিনে তাঁর সকল সৃষ্টিবের সমান অধিকার — এই মতবাদ-কেন্দ্রিক রাশ্যানিয়াত তত্ত্ব প্রচার করেন।[৭৯] এই ধারণা থেকে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ, প্রভৃতি বিরোধী ইস্যুকেন্দ্রিক আন্দোলনে তিনি 'বাস্তবপ্রয়োগ' ও 'ইসলামের মূল্যবোধ' এই দুই ধারার সামঞ্জস্যকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু ল হাশিম ধর্ম অপেক্ষা বাস্তবতাকেই বেশি জোর দিতেন। ১৯৩৭ সালে অইনসভায় তিনি মদের দাম বৃদ্ধি করতে সরকারকে অনুরোধ করেন, মুসলমানরা সত্তায় হারাম খাচ্ছে বলে নয়, বেশি সংখ্যক লোক মদ্যপ হয়ে যাচ্ছে বলে।[৮০] এমনকি তিনি শরিয়ত আইনের বিরোধিতা করেন এবং সাফল্যও পান।[৮১]

**(ছ) হাশিম ও বঙ্গভূমি ঃ** আবুল কাশেম যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঢাকার খাজা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জনমত আদায়ে ব্যস্ত, বাংলার ঠিক সেই যুগ সন্ধিক্ষণে (১৯০৫) আবুল হাশিম জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আবুল হাশিম পিতা আবুল কাশেমের রাজনৈতিক ধারণার বিরুদ্ধবাদী হলেও অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন একমতাবলম্বী। স্মর্তব্য, বঙ্গভঙ্গের একবছর পর মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলে খাজা সলিমুল্লা সহ অন্যরা বঙ্গভঙ্গকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে বৃটিশ বদান্যতা বলে ব্যাখ্যা করেন। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বরবিভাগের অনুকূলে কংগ্রেসের একটি 'সংখ্যাগরিষ্ঠদল মরীয়াভাবে রাজনীতি শুরু করেন। তার ফল আজ সবার জানা।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সে সময় বাংলাদেশের ব্যবচ্ছেদ যখন অনিবার্যভাবে হতে চলেছে তখন সোহ্‌রাওয়ার্দি, শরৎ বসু প্রমুখের ন্যায় আবুল হাশিমও এক স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের প্রয়াসে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পাকিস্তান গঠন ও বাংলাভাগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ তিন মতাদর্শে বিভক্ত ছিল। ঢাকার খাজাগোষ্ঠী নাজিমউদ্দিন, শাহাবউদ্দিন প্রমুখেরা ভেবেছিলেন বৃটিশদের বদান্যতাতে বাংলার যতটুকু পাকিস্তানের ভাগে আসে তাইই ভাল। সেখানে তারা একক প্রতিষ্ঠা পাবে। পশ্চিমবঙ্গের আকরম খাঁ, কলিকাতার ইস্পাহানী প্রমুখ অবাঙালি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী চেয়েছিলেন বাংলা ভাগ হোক এবং কলকাতার পুরোটা না হলেও অর্ধেকটা পাকিস্তানের মধ্যে যাক। সোহ্‌রাওয়ার্দি, হাশিম প্রমুখ লীগ রাজনীতিবিদরা গোটা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একে এবং একক সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা গঠনে উদ্যোগী ছিলেন। সমাত্তরালভাবে কংগ্রেসের একটা বড় দল বাংলা ভাগের

জোরদার দাবীদার ছিলেন।[৮২] জনসংঘ আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, ভারত ভাগ না হলেও বাংলাভাগ অনিবার্য।[৮৩] কমিউনিস্ট পার্টি তাঁদের সামর্থ্য নিয়ে অবিভক্ত বাংলার সপক্ষে অজস্র মিটিং মিছিল করেছেন, যদিও শেষপর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহের মোড়ে বাংলা ভাগ মেনে নিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে সোহ্‌রাওয়ার্দি, শরৎ বসু, হাশিম প্রমুখেরা যখন স্বাধীন বাংলা গঠনের জন্য প্রস্তাব ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন বিভিন্ন মহল থেকে শোরগোল উঠল যে বাংলা একক স্বাধীন হলে সেখানে মুসলমানদের প্রাধান্য বজায় থাকবে। অন্যদিকে মুসলিম লীগ ভয়ে ভীত হয়ে গেল যে বৃহৎ ভারতের পাশে স্বাধীন বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষিত হবে না।

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে আবুল হাশিমের মতামত হল, স্বাধীন বাংলার হিন্দু সমাজ সাম্প্রদায়িক বিধান অনুযায়ী এবং মুসলমান সমাজ শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং কেউ কারও প্রতি আধিপত্য বিস্তার করবে না। চাকুরির ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট-এর নীতি অনুযায়ী ৫০ : ৫০ বিধান কার্যকরী হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন মুসলমান মন্ত্রীসভার উপর হিন্দুসমাজের যে বিরূপ ধারণা তা দূর করতে মুসলমানদেরই উদ্যোগ নিতে হবে। সেদিনের যত্রতত্র দাঙ্গা প্রসঙ্গে তিনি বলেন দাঙ্গা সাধারণ হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক সংঘটিত হয় না, দাঙ্গা বাধাচ্ছে বিদেশী কায়েমী স্বার্থবাদীরা এবং তাদের ভারতীয় মিত্ররা। তিনি অন্য এক বিবৃতিতে বলেন, যাঁরা বঙ্গভঙ্গ চান তাঁরা সাম্রাজ্যবাদী এবং ধনবাদীদের কায়েমী স্বার্থের দালাল। একই প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ হিন্দু-মুসলমানদের চরমবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ও মুসলমানের কাছে হার না মানার কথা বলেন। তিনি মনে করেন ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিপতিরা নিজস্বার্থে বাংলাভাগ করতে চায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আলোচনা চক্রে হাশিম এদেশের হিন্দু-মুসলমান মনীষীর নাম উল্লেখ করে তাদের একাত্মবোধ স্পিরিটের বিরুদ্ধে না যেতে অনুরোধ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলার এই দুর্দিনে বাংলার যুবক সম্প্রদায়ই বাংলাকে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "শৃঙ্খলমুক্তির" শুভ মুহূর্তে বাঙালী আত্মঘাতী উন্মাদনায় মাতিয়াছে। তাহার এই উন্মাদনার অনিবার্য পরিণাম যে সামাজিক বিপ্লব, এই সহজ কথাটি উপলব্ধি করার চেতনা তাহার নাই।"[৮৪] তিনি আর এক বিবৃতিতে বলেন, লীগ নেতারা বড় চাকরির লোভে বৃটিশের বাংলা বিভাগ প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় তিনি প্রগতিশীল মুসলিম ও বামপন্থীদের সঙ্গে মিশে রাজনৈতিক-সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

১৯৪৭-এর ৩রা জুন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের ভোটাভুটিতে লীগ সদস্যরা বঙ্গবিভাগের সপক্ষে ভোট দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হাশিম এক বিবৃতিতে বলেন, মুখ্যত তিনটি কারণে মুসলিম লীগ সদস্যরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রথমত স্বভাববিদ্ধ জিন্নাভীতি, দ্বিতীয়ত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় এবং তৃতীয়ত যদি 'জিন্নাকে অসন্তুষ্ট করা হয় তাহলে নবগঠিত পাকিস্তানে পদ পাওয়া যাবে না। পরের দিন 'ডন' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে হাশিমকে "A Snake in the grass" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[৮৫]

২০শে জুন, ১৯৪৭ বঙ্গভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে যে ভোট হয় তাতে বঙ্গভঙ্গের সপক্ষে ভোট পড়ে বেশি। একই দিন বিকেলে সোদপুরের আশ্রমে হাশিম গান্ধিজিকে দেখা করতে গেলে গান্ধিজি বলেন "হাশিম তুমি পরাজিত হয়েছ; তুমি বাংলাভাগ রদ করতে পারলে না। তবে আমি নিশ্চিত যে তুমি অন্ধ না হলে সাফল্য পেতে"।[৮৬]

আবুল হাশিম ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও সংগঠক। দলের তাঁবেদার বলতে যা বোঝায় তা তিনি কখনই ছিলেন না। স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও চিন্তাধারা উচ্চারণে তিনি কখনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। অবশ্য অনেকেই তার রাজনীতির ধারাকে "মেকিয়াভেলি পলিটিক্স" বলে মনে করেন। তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল ইসলামিক দর্শনপরিপ্রেক্ষত এবং তা তাঁর মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতিশীল চিন্তাধারাকে কখনও ব্যাহত করেনি। ইসলাম ও প্রগতি, ইতিহাস ও বর্তমানের বাস্তবোচিত সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁর জীবনদর্শনে।

॥ ৭ ॥

এই শতকের পাঁচের দশকে এই পরিবারে ত্রি-ধারার রাজনীতি পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে এদের রাজনীতির ধারা সংস্কারমুখী ছিল না, ছিল আন্দোলনমুখী। আবুল হাশিম লীগের তখন প্রভাবশালী নেতা হলেও, তার পরিবারের মধ্যে লীগ রাজনীতির প্রভাব ছিল সীমিত। আবুল হায়াত এবং এই পরিবারের নাতিয়া সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ ও সৈয়দ মনসুর হবিবুল্লাহ্‌র প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি।

নবাব আব্দুল জব্বারের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। মধ্যমপুত্র খানবাহাদুর আব্দুল মোমিনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মোমিনের পুত্র আব্দুর রসিদ মুসলমানদের সংরক্ষিত আসনে ১৯৩৫ সালে বীরভূম জেলা থেকে আইনসভায় নির্বাচিত হন। আব্দুল জব্বারের তৃতীয়পুত্র আব্দুস সামাদ ১৯২১-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় জেলা খেলাফত কমিটির নেতৃত্ব দেন।[৮৭] ঐ সময় তিনি জেলা



কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। অজয় বাঁধ কমিটি এবং অজয় বাঁধ আন্দোলনের কমিটি আব্দুস সামাদ-এর নেতৃত্বে শুরু হয়। তিনি এই দুই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৮৮] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীরা এই আন্দোলন চালিয়ে যান। আব্দুস সামাদের পুত্র আব্দুল আহাদ ১৯৪০ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে (কমিউনিস্ট সমর্থনপুষ্ট) লীগ প্রার্থী আব্দুল কাইয়ুমকে হারিয়ে পশ্চিমে ময়লকোট থেকে জেলা বোর্ডে নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে আহাদ সরাসরি কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন।[৮৯] আব্দুল আহাদের পুত্র আব্দুল বাসেত বামপন্থী শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। নবাব জব্বারের কনিষ্ঠ-পুত্র আব্দুল হালিম মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী-ফারসীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি রাজনীতি না করে চাকরীতে প্রবেশ করেন। তৎপুত্র মেহবুব জাহেদী (বর্তমান মন্ত্রীসভার মন্ত্রী) বালাকালেই অজয় বাঁধ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি IPTAতে যোগদান করেন।[৯০] স্বাধীনতার পরবর্তীকালে তিনি কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন।

## টীকা ও সূত্র নির্দেশিকা


৫৫. Abul Hashim, In Retrospection, Mowla Brothers, Dacca, 1974, P. 16

৫৬. ibid, P. 18

৫৭. ibid, P. 34

৫৮. ibid, P. 36

৫৯. ইতিপূর্বে লীগের হিসাবরক্ষক ছিল বটে তবে কোন খাজাঞ্চীখানা ছিল না। প্রয়োজনমতো চাঁদা সংগ্রহ করে লীগের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। হাশিম সম্পাদক নির্বাচিত হবার পর নির্দিষ্ট চাঁদার হার নির্ধারণ করেন; অর্থাৎ তিনি লীগকে খাজাদের দরবার থেকে সাধারণ মানুষের পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

৬০. আবুল হাশিম, মফিজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০, পৃঃ ৩৫

৬১. Abul Hashim, op. cit. P. 37

৬২. ibid, P. 79

৬৩. ibid, P. 117

৬৪. ibid, P. 119

৬৫. ibid, P. 116

৬৬. ibid, P. 18

৬৭. ডঃ অমলেন্দু দে, মুসলীম লীগ রাজনীতি, পৃঃ ৫৪ (ইতিহাস অনুসন্ধান ৫; পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ; কে. পি. বাগচী, ১৯৯০)

৬৮. কালিপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃঃ ১০৮

৬৯. Abul Hasim, op. cit. P. 109

৭০. ১৯৩৮ সালের সর্বভারতীয় লীগ সম্মেলনে সভাপতি জিন্নার এক প্রস্তাবকে হসরত মোহানী অ-ইসলামিক বলে চিহ্নিত করেন। ঐ সম্মেলনে আবুল হাশিম যুক্তি দিয়ে দেখান যে জিন্নার প্রস্তাব পুরোপুরি ইসলাম অনুসারী। সভায় ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন থেকে জিন্না আবুল হাশিমকে "মাওলানা সাহেব" বলে সম্বোধন করতেন।
— See, Abul Hashim, op. cit. P. 20

৭১. Abul Hashim, op. cit. P. 63

৭২. ibid, P. 54

৭৩. ibid, P. 78

৭৪. ডঃ অমলেন্দু দে, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

৭৫. Abul Hashim, op. cit. P. 40

৭৬. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ, প্রথম প্রকাশ, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃঃ ১১০, ১৩২, ১৩৭।

৭৭. Abul Hashim, op. cit. P. 45

৭৮. বর্ধমানের ২ নং পারকাস রোডের বাড়ীতে এঁরা থাকতেন। সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্-এর রচনা থেকে জানা যায় এই বাড়ীটি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনৈতিক আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছিল।

৭৯. 'রব' বা প্রভু থেকে রাব্বানিয়াত তত্ত্বের উৎপত্তি। রব বা প্রভুর আসমান ও জমিনের উপর একাধিপত্য। এককথায় তাঁর মতে এই তত্ত্ব হল, স্রষ্টার নিয়ম অনুসারে মানবজাতির দৈহিক মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ। আবুল হাশিম এই দর্শন বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা আজাদ সুবাহ্‌নীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

৮০. Assembly proceedings official Report, Bengal Legislative Assembly, Second session, 1937, PP - 1042 - 43

৮১. Abul Hashim, op. cit. P. 11
শরিয়তের আইন অনুযায়ী পিতার সামনে সন্তান মারা

গেলে মৃত সন্তানের সন্তানদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থাকে না। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানকে সুপারিশ করে তিনি অনাথ সন্তানের উত্তরাধিকার ব্যবস্থা চালু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবুল হাশিমকে ছাত্রাবস্থা থেকেই এ বিষয়ে ভাবিয়ে তুলেছিল বলে তিনি তাঁর জীবনীমূলক পুস্তকে লেখেন।

৮২. দৈনিক স্বাধীনতা, ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৭ — ১৩ তারিখে বাংলা প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এক বিবৃতিতে বলেন, লীগ যদি বঙ্গভঙ্গের দাবী না মানে তাহলে জাতীয়তাবাদী বাঙালী সারা বাংলায় অহিংস গণআন্দোলন শুরু করবে।

৮৩. তারকেশ্বর সম্মেলনে (৫ এপ্রিল) শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেন, বঙ্গভঙ্গ করেই পাকিস্তান ভঙ্গের কথা। (৭ এপ্রিল দৈনিক স্বাধীনতা ১৯৪৭)

২৪ মে সিউরিতে এক সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার নেতা এন. সি. চ্যাটার্জি বলেন, হিন্দু বাংলা বিনা লড়াই-এ এক ইঞ্চিও জমি দেবে না। (২৬ মে, ১৯৪৭, দৈনিক স্বাধীনতা)।

৮৪. দৈনিক স্বাধীনতা, ১লা জুন, ১৯৪৭।

৮৫. Abul Hashim, op cit. P. 160.

৮৬. ibid, P. 163

৮৭. সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫।

৮৮. ঐ

৮৯. বর্তমান লেখক কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার : মেহবুব জাহেদী (৮-১-৯৩)।

৯০. ঐ

এই লেখাটির পূর্ব প্রকাশিত অংশে (চতুরঙ্গ শরৎ ১৪০০) পৃঃ ১৬৯-এর ২য় কলমের ৩য় লাইনে '১৯১৫'-র জায়গায় '১৯৩৫' এবং পৃঃ ১৭০-এর ২য় কলমের ১৪ লাইনে '১৯০৪'-র জায়গায় '১৯৩৪' হবে।



# গঙ্গা এখন ভাগের 'মা'

তিমির বসু

ভারত ভেঙে পাকিস্তান। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশ জন্মের পরও ভারতীয় মানসিকতায় বাংলাদেশ এখনও আর একটা স্বতন্ত্র 'পাকিস্তান' ছাড়া আর কিছুই নয়। শুরুতে অবস্থান অন্য রকম ছিল সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক আবেগ মূলত দানা বেঁধেছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঐক্যবোধ ঘিরে। অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল বুঝিবা বাংলার দ্বিতীয় নবজাগরণ শুরু হল। আর ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উচ্ছ্বাস ছিল অন্য কারণে। তাদের ধারণা হয়েছিল হারিয়ে যাওয়া বৃটিশ ভারতের বিশাল বাজারের কিছুটা অন্তত পুনরুদ্ধার করা গেল। দিল্লীওয়ালারা ধরেই নিয়েছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুর্বল বাংলাদেশ সবসময়ই অধীনতামূলক মিত্রতা বজায় রাখবে। হাজার হলেও বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে বহু ভারতীয় জওয়ান জীবন দিয়েছে। ভারত বাংলাদেশ পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হবার পক্ষে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি শুরু থেকেই একটা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করেছে। এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন আশা করা বাতুলতা। সত্যি কথাটা সোজাভাবে বলার ঝুঁকি অনেক, কিন্তু সত্য এড়িয়ে যাওয়ার বিপদও নেহাত কম নয়।

দিল্লীওয়ালাদের ২১শে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্য নিয়ে মাথাব্যথা নেই। বরং ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি মানসে যে ধরনের সাংস্কৃতিক আবেদন সৃষ্টি করে তার রাজনৈতিক বাতাবরণ বিস্তৃত হোক দিল্লীওয়ালারা মোটেই এটা চায় না। বাংলাদেশেও এমন একটা রাজনৈতিক প্রবণতা রয়েছে যার লক্ষ্য বৃহত্তর বাংলার ধারণা তৈরি করা। পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব কিছুটা পড়তে বাধ্য, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙার পর। রাশিয়ায় ধনতন্ত্র ফিরে আসায় কেবলমাত্র মস্কোপন্থী বামেরাই দিশেহারা ঘটনা এমন নয়। অতিবামেরাও রাজনৈতিক ভাবে সমান দিধাগ্রস্ত। এদের এক অংশ এখন প্রদেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদকেই মুক্তির পথ ভাবছে। কিছুদিন আগে কেরালায় শেয়ার বাজার ঘেরাও করে এরা এদের জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই এরা বাংলাদেশে নিজেদের সমর্থক খুঁজে পেতে চাইছে। ফলে দিল্লীর শাসকরা নানা কারণেই একাত্তরের বাংলাদেশ ফিরে পেতে পারে না। বাংলাদেশের সঙ্গে অ-স্বাভাবিক সম্পর্কের জের পোহাতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের।

জগৎ শেঠরা গোটা পূর্বভারতকে নিজেদের জমিদারি ভাবে। দিল্লী বোধে কিম্বা আমেদাবাদ — এসব জায়গায় এরা তেমন সুবিধা করতে পারে না। গুজরাতি কিম্বা পার্শি বানিয়ারা রয়েছে। মাদ্রাজে রয়েছে চেট্টিয়ারারা, কিন্তু বাংলাদেশের বাজারও এদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এটা এরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না।

বাংলাদেশের বহু পটপরিবর্তন সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক কিছুতেই স্বাভাবিক হচ্ছে না। অদূর ভবিষ্যতে চলতি কূটনৈতিক সম্পর্কের বাইরে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভবনা ক্ষীণ।

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছেদ মানেই দীর্ঘ পাকিস্তানি ইতিহাসের অবলুপ্তি নয়। কিম্বা পাকিস্তানের রেখে যাওয়া বিরোধের অবসান নয়। দূর হয়নি দীর্ঘদিনের অ-প্রতিবেশীসুলভ অবিশ্বাস। ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে ভারতের বিরোধ পাকিস্তানের সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ এই বিরোধজনিত তিক্ততা পেয়েছে। তাদের বক্তব্য ফারাক্কা থেকে যে পরিমাণ জল পাবার কথা বাংলাদেশ কখনই সেটা পায়নি এবং এর ফলস্বরূপ বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল প্রায় মরুভূমি হতে চলেছে।

অবশ্য ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের আপাত উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয়েছে সে বিষয়ে আজ আর খুব বেশি দ্বিমত আছে বলে মনে হয় না। হুগলী নদীতে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং কলকাতা বন্দরে মাঝারি ধরনের জাহাজ যাতে সারা বছর চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কিন্তু কলকাতা বন্দর আজ মৃতপ্রায়। কিছুটা না মরে বেঁচে থাকা গোছের অবস্থা। বন্দরের কাজকর্ম অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ এখন জমি বিক্রী করে অর্থসংস্থান করতে ব্যস্ত। এমনকি আরও নিম্ন-অববাহিকায় এত যে ঢাকঢোল পিটিয়ে হলদিয়া বন্দর তৈরি হল কলকাতার পরিপূরক হিসাবে তার অবস্থাও সঙ্গিন। 'হলদিয়া' ইতিমধ্যেই মাঝারি জাহাজের পক্ষে অগম্য হয়ে উঠেছে। আসলে হলদিয়ায় বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচনই ছিল ভ্রান্ত। এদেশে প্রায় সমস্ত পরিকল্পনাই অদূরদর্শিতার নামান্তর। চালু হবার পর বছর দশেক যেতে না যেতেই প্রকল্প অকেজো হয়ে পড়ে কিম্বা সমস্ত পরিসংখ্যান ভুল প্রমাণ করে নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফারাক্কা থেকে ৪০,০০০ কিউসেক জল আসার কথা ছিল হুগলী নদীতে, কারণ ঐ পরিমাণ জল পেলে নাকি কলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা হবে। ব্যারেজ চালু হবার পর কোনদিনই এই পরিমাণ জল হুগলী নদীতে ঢোকেনি। আর কম জল আসার পরিণতি হয়েছে সম্পূর্ণ বিপরীত — উচ্চ অববাহিকার কিছু পলি এসে নিচু অববাহিকায় জমা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কলকাতা বন্দরের সার্বিক নাব্যতাই দ্রুত নষ্ট হয়েছে। শুরুতে বাংলাদেশের বক্তব্য

ছিল — ফারাক্কায় শুখা মরশুমে ৫৫০০০ কিউসেক জল পাওয়া যেতে পারে আর ঐ জল ছাড়া বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের নদী পরিকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৯৭৭ সালের ভারত বাংলাদেশ যৌথ চুক্তি অনুযায়ী এপ্রিলের প্রচণ্ড খরার সময় প্রথম দশদিনে বাংলাদেশের পাওয়ার কথা ৩৫,০০০ কিউসেক আর কলকাতার বা হুগলী নদীর ২৪,০০০ কিউসেক। মজার ব্যাপার হচ্ছে শুখা মরশুমে ফারাক্কা দিয়ে এই পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় না। ফারাক্কা ব্যারেজের প্রাক্তন ম্যানেজার দেবেশ মুখার্জির মতে শুখা মরশুমে ১৯৪৮ সাল থেকে যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে ফারাক্কায় হয়ত সাকুল্যে ৪০,০০০ কিউসেক জলই পাওয়া যেতে পারে। বর্তমানে ফারাক্কায় জলের প্রবাহ আরও কমে গেছে। কিন্তু গঙ্গার জল যাচ্ছে কোথায় ? ১৯৮১ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুসারে উত্তরপ্রদেশে গঙ্গার উচ্চ অববাহিকায় ছোট বড় এবং মাঝারি ধরনের সেচ প্রকল্পের সংখ্যা ৩৫০ বা তার একটু বেশি। এরা ২০,০০০ কিউসেক জল সেচের জন্য গঙ্গা থেকে তুলে নেয় কোন আইনের তোয়াক্কা না করেই। প্রসঙ্গত তখনও অনেক সেচ পরিকল্পনার কাজ চলছিল, পরবর্তীকালে সেগুলো সম্পূর্ণ হয়েছে। সেই সময়কার হিসাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ হবার পর এদের আরও ১৮,০০০ কিউসেক জল তুলে নেবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে হিসাবের ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ জলবণ্টন চুক্তি হচ্ছে সেই হিসাবে সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সাদৃশ্য খুব কমই আছে। সুতরাং কলকাতা বন্দর কোন কালেই ৪০,০০০ কিউসেক জল পেতে পারে না আর বাংলাদেশও তার আকাঙ্খিত জল পদ্মায় নিয়ে যেতে পারে না — বিশেষ করে শুখা মরশুমে। কারণ অত জলই ফারাক্কায় নেই। ফলে গঙ্গা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বিরোধ অদূর ভবিষ্যতে মিটবে বলে মনে হয় না।

এখন মুর্শিদাবাদে পদ্মা আর ভাগিরথী মিশে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ভারত বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের সামনে নতুন সমস্যা দেখা দেবে।

ফারাক্কা ব্যারেজ সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। বিগত ১৮ বছর যাবৎ ফারাক্কা সমস্যা নিয়ে কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান কোন পক্ষই দিতে পারেনি। সরকারী পর্যায়ে উভয় দেশের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনার কোন শেষ আছে বলে মনে হচ্ছে না। ফারাক্কা নিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ মাঝেমাঝেই ভারত-বিরোধী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সবসময় বাংলাদেশে একটা ভারত-বিরোধী রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি হয়ে আছে। 'ফারাক্কা' এর অন্যতম প্রধান কারণ। সম্প্রতি কলকাতায় কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এক কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনৈক বাংলাদেশি প্রতিনিধি জানালেন যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিরোধী যে সাম্প্রদায়িকতা রয়েছে তার মূলে ফারাক্কা বহুলাংশে দায়ী। কথাটা বোধহয় একেবারে মিথ্যে নয়। গঙ্গা এখন ভাগের 'মা' আর 'ফারাক্কা' গঙ্গার সমস্যা বাড়িয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের ভারত বিদ্বেষী মনোভাবের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ধাক্কা শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের উপর। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই এই জিনিস চলে আসছে। বিহার কিম্বা উত্তরপ্রদেশে বাংলাদেশের ভারত-বিরোধী উত্তাপ অনুভব করবার লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। আর প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশের বেশির ভাগ মানুষ হয়ত ভাবতেই পারে না একটা ব্যারেজ কী ভাবে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। এই যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে এত হৈ চৈ হচ্ছে তারও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধাক্কা শেষ পর্যন্ত এসে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের উপর।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের তিক্ততার ফসল 'ফারাক্কা'। কিন্তু ভারত আর পাকিস্তান নিজেদের মধ্যে 'সমঝোতা ট্রেন' চালাচ্ছে অমৃতসর আর লাহোরের মধ্যে অথচ ভারত ও বাংলাদেশ এখনও পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা চালু করতে পারল না। চীনের সঙ্গে সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ এবং আসাম-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর বিশেষ বাণিজ্যিক অঞ্চল সহজেই তৈরি করা যেত। তাহলে চোরাচালান আর বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে এত সোরগোল করবার অবকাশ থাকত না। এখনও পর্যন্ত উভয় দেশের পত্র-পত্রিকার স্বাভাবিক চলাচল শুরু হল না। এর ফলে হিন্দীভাষীদের খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। কিম্বা তামিলভাষীরাও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে না। সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক — এই উভয় ক্ষেত্রেই এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক বর্তমানে ভারত, বাংলাদেশ আর নেপাল — সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকার এই তিন দেশের জন্য এক যৌথ নদী পরিকল্পনা করতে ব্যস্ত। উদ্দেশ্য মহৎ — বন্যানিরোধ। এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য। বন্যানিরোধের জন্য আজ পর্যন্ত ভারতে যত বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার ফলে বন্যার প্রকোপ বেড়েছে। প্রসঙ্গত উত্তর বিহার তথা উত্তর প্রদেশের ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকাতেই গঙ্গার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে। এদের উপরই বিশ্বব্যাঙ্ক নতুন করে বাঁধ দেবার কথা ভাবছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে গঙ্গা নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে আরও তিক্ততা সৃষ্টি হবে।

(রচনাকাল ২৪.৯.৯৩)

স্মরণে

# শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় (১৯৩২-৯৩)

অনির্বাণ রায়

প্রবীণদের নবীন বন্ধু আর নবীনদের প্রবীণ সুহৃদ্ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁর সকল প্রিয়জনের কাছ থেকে বড়ই অসময়ে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন এ বেদনা সহজে ভোলবার নয়। গত বছর দশ অক্টোবর শিশির মঞ্চে গোপাল হালদার স্মরণ সভায় একটি শোকলেখন পাঠকালে সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চলমান সভা যাতে সে সংবাদ জানতে না পারে সে-ব্যবস্থা করা হলে তিনি দুই বন্ধুর সহায়তায় ভর্তি হন শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালে। এখানেই ১২ অক্টোবর রাতে শুভেন্দুশেখর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে প্রথম দেখি সাহিত্য অকাদেমির কলকাতা দপ্তরে। তিনি ছিলেন সেখানকার আঞ্চলিক সচিব। প্রথম সাক্ষাতে তেমন কোনও কথাবার্তা হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে শুরু করলে সম্পূর্ণ না হোক তাঁকে অনেকটা জানবার সুযোগ হয়। কুড়ি বছরের বন্ধুতায় একটি দিনের জন্যও তিনি ভুলেও কোনওদিন এই কথাটা মনে করিয়ে দেননি যে আমাদের বয়সের ব্যবধান ছিল কুড়ি বছরের। সমানে সমানে তর্ক করেছি। নানা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কখনও ব্যক্তিগত কোনও সমস্যা সামনে মেলে ধরে বলেছেন, কী করব বলো। গোপনীয়তায় তাঁর কোনও রকম আস্থা ছিল না। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়তে দিতেন অবাধে বা পড়ে শোনাতেন, মুখে বলতেন। এ সবের পেছনে ছিল তাঁর এই বিশ্বাস : একজনের সমস্যা থেকে আর একজন যেন কিছু শিখতে পারে। বামপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী শুভেন্দুশেখর ব্যক্তি-মালিকানায় বিশ্বাস করবেন না এ তো স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু তা বলে নিজের কেনা কোনও গ্রন্থে কখনও নামস্বাক্ষরও করবেন না ! হ্যাঁ, তাই-ই। নাম-স্বাক্ষর ব্যক্তি-মালিকানার দ্যোতক। অতএব করো বর্জন। এই সঙ্গে আর-একটা কথা মনে পড়ছে। একবার কোনও একটা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ভালভাবে সন্তান পালন করা — সেটা সমাজসেবারই অঙ্গ। এমন কথা আর কারও মুখে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

শুভেন্দুশেখর ছিলেন খোলা মনের মানুষ। প্রশংসা করতেন যেমন উঁচু গলায়, ঝগড়াও করতেন তেমনি গলা না নামিয়ে। অভিমান ছিল। রাগ ছিল। দুঃখ বেদনা সবই ছিল। কখনও বুঝতে দিতেন, কখনও বা দিতেন না। কখনও কখনও কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অনর্গল বাক্যবিনিময়কে একটি-দুটিতে নামিয়ে আনত। অবশ্য মেঘ ক্ষণিকের। কিছুদিন যেতে না-যেতেই তাঁকে পাওয়া যেত পূর্বেকার মেজাজে। শোনা যেত প্রাচীন প্রসঙ্গ। ,বিশ্বরাজনীতির হাল-হকিকৎ। বহু মানুষের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাঁর বর্ণনার গুণে তাঁরা আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠতেন। কিছুকাল সেবাগ্রামে থাকার সূত্রে গান্ধীজির সংস্পর্শে এসেছিলেন। গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধায় কোনরকম খাদ ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ছিল তাঁর প্রাণের বুড়ি মা। পরিষদের কথা বলতে তাঁর কোনও শ্রান্তি-ক্লান্তি ছিল না। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন তাঁর ভাষণের প্রতিবেদন সূত্রে একটি সাময়িকপত্র লিখছেন :

> পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দুবাবুই প্রথম যথোচিত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে একটি বিস্মৃতপ্রায়, অপরিহার্য ও গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। আপাত ইঙ্গিতহীন তার ভাষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটি বিচারশীল মানুষমাত্রকেই নাড়া দিতে বাধ্য। আজ থেকে বিরানব্বই বছর আগে মহারাজ বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়িতে বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়েছিল। পরের বছর সদস্যদের আপত্তিতে তার নাম পরিবর্তন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই নামকরণ হয়। সরকারী অর্থের তথা রাজানুকূল্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে সর্বসাধারণের সমর্থন-সহযোগিতায় এবং দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বদান্যতায় তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। হালসীবাগানে তার নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়। সে যুগের সমস্ত খ্যাতকীর্তি বিদ্বজ্জ্বল মনীষীই সাহিত্য পরিষদের দক্ষিণবাহু হয়ে উঠেছিলেন। স্বদেশ চর্চার মহৎ আদর্শ ও আন্তরিক উদ্যম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল সেদিন। ফলে সত্যিকারের গুণিজনের সক্রিয় সহযোগিতায়, পণ্ডিত গবেষকের শ্রমে ও নিষ্ঠায় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ ন্যাসপত্রের সুচিন্তিত পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হতে থাকে দ্রুতগতিতে। দেশের অন্যতম জ্ঞানপীঠে পরিণত এই পরিষদ যতদিন কলুষমুক্ত

ছিল, ব্যক্তিস্বার্থ ও অন্তঃকলহে খণ্ডিত হয়নি ততদিন আর্থিক সমস্যা তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। ... সংরক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে কৃত কীর্তি এবং দুর্লভ সংগ্রহগুলি এখন একেবারেই বিনষ্টির মুখোমুখি। স্থানাভাবে, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে বঙ্গভারতীর, বঙ্গ সংস্কৃতির এই শতবর্ষী বাতিস্তম্ভ নির্বাণের মুখোমুখি। এই জরুরী মুহূর্তে যখন সাহিত্য পরিষদকে সঠিক সাহায্য দিয়ে পুনর্জীবিত করে নবীকরণ, আধুনিকীকরণের আশু প্রয়োজন ছিল তখন তাকে পাশ কাটিয়ে আর একটি প্রতিষ্ঠানের আদ্যকর্মে হাত দেওয়া কতখানি যুক্তিযুক্ত হল জানি না।

সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিকী বছরে তাঁর কথা সবিশেষ মনে পড়ে।

শুভেন্দুশেখর একান্তভাবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথে সমর্পিত। স্কুল সহপাঠীদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তিকালে, সেই অল্প বয়সেই তিনি অশ্রুমোচন করতেন। রবীন্দ্র-প্রয়াণের সংবাদ স্কুলে এসে পৌঁছলে অন্যদের ভাববার অবকাশ না দিয়ে তিনি অবিলম্বে ক্লাস ত্যাগ করে শোকমিছিল অভিমুখে ছুটেছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথের পাঞ্জাবীর হাতার রং হাতে এসে কোথায় যে মিলিয়ে গেল বুঝতে পারলাম না।' এ কথা তাঁর মুখে বহুবার শোনা। বুঝতে না-পারার সেই বিস্ময় আমৃত্যু তাঁর সহযোগী ছিল। 'তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কভু নাহি কব।' রবীন্দ্রনাথের এই কাব্যাংশ আমরা তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। স্মৃতি এইখানে মনে করিয়ে দেয় নতুন কলমের সচলতা তিনি পরীক্ষা করতেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' লিখে। নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথকে প্রয়োগ করে বুঝতে চাইতেন, জানতে চাইতেন। সমকালকে মাপবার মানদণ্ড তাঁর কাছে ছিল রবীন্দ্রনাথ। 'প্রাসঙ্গিকতার দায়' নামে একটি লেখায় শুভেন্দুশেখর লিখেছেন :

> কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁকে অস্বীকার করে রুচি পরিবর্তনের আগ্রহে যান্ত্রিক পাল্টাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে চেষ্টার ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়ে বলে বসেছি 'এগোই বা না এগোই, একেলে হতেই হবে।' এবং সেই একেলে হবার নেশাতেই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে চেয়েছি ...
>
> আসলে একেলে হবার ব্যাকুলতা থেকে নয়, ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে প্রগতির বিচারে দেখতে হবে রবীন্দ্রনাথ আজ আমাদের জীবনে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছেন কি ? যদি হারিয়ে থাকেন তবে বুঝতে হবে আমরা একেলে হবার নেশায় ইতিহাসের শিক্ষা নিতে ভুলেছি।
>
> রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাধনা নিশ্চয়ই ইতিহাস নির্দিষ্ট সাধনা, কিন্তু তাঁকে অস্বীকার করার কৌশলের মধ্যে আছে আমাদের ইতিহাসের বিকৃতি — ।

তিনি একেলে হতে চাননি। অনেকক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একলা মানুষ। চলেছেন মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড সিধে রেখে। পরিণত বয়সে চাকরি থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাঁর পক্ষেই সম্ভব। হতে পারে এ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেন-এর কাছ থেকে। পুলিনবিহারীর কাছে তাঁর রবীন্দ্রচর্চা পরিশীলিত, পরিমার্জিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রতিষ্ঠা করলে পুলিনবিহারী শুভেন্দুশেখরকে সহযোগী করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ -বিষয়ক একাধিক কাজ তাঁরা দুজনে মিলে করেছিলেন। পুলিনবিহারী-শুভেন্দুশেখর-এর সম্পর্কের ইতিহাস স্বতন্ত্র আলোচনা দাবি করে। 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ সম্পাদনা এবং পুলিনবিহারী সেন' প্রবন্ধের উপসংহারে শুভেন্দুশেখর লিখেছেন :

> পুলিনবিহারী রবীন্দ্র-জীবনাদর্শকেই তাঁর জীবনব্রত করেছিলেন। রবীন্দ্র-বাণীর যথাযথ সংগ্রহ সংকলন এবং প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের অন্বিষ্ট। রবীন্দ্রগ্রন্থের একনিষ্ঠ সম্পাদনা তাই পুলিনবিহারীকে সার্থক রবীন্দ্র-ভাবনাপুষ্ট মানুষে পরিণত করেছিল। তাই তাঁর প্রয়াণে আমরা এক সার্থক রবীন্দ্র-গ্রন্থ সম্পাদককেই হারাইনি, এক প্রকৃত রবীন্দ্র ভাবাদর্শে সমুজ্জ্বল মানুষকেও হারালাম।

শুভেন্দুশেখরকে হারিয়ে আমরাও আজ সেই একই কথা স্মরণ করি।

## সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জী

২৭ এপ্রিল ১৯৩২ পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে জন্ম। পিতা নলিনীকান্ত, মাতা সরযূ।

চার বছর বয়সে চলে আসেন কলকাতায়। কর্পোরেশন স্কুল, ঘাটালের একটি বিদ্যালয়, পার্ক ইনস্টিটিউশন-এ শিক্ষান্তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস. সি., মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে সাম্মানিক সহ বি. এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার এম. এ. (১৯৫৪)। শান্তিনিকেতনে বিনয়ভবনের ছাত্র (১৯৪৯-৫০)। ১৯৭০-এ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে পি. এইচ. ডি। গবেষণার বিষয় ছিল : রবীন্দ্রনাথের প্রভাতসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থের পাঠভেদ সংকলন : কাব্যরূপ ও ভাবের বিবর্তনে তার গুরুত্ব বিচার।

কর্মজীবনের শুরুতে বরাহনগরের একটি বিদ্যালয়ে অল্পকাল শিক্ষকতা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালার ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ (১৯৫৪-৫৭), পরবর্তীকালে পরিষদের সহকারী সচিব এবং সচিব (১৯৯৩)।



উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের সিনিয়র লেকচারার (১৯৫৭-৬৭)। গবেষণা সহকর্মী, রবীন্দ্র চর্চা-প্রকল্প, রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতন (১৯৬৭-৭১)।

আঞ্চলিক সচিব, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা (১৯৭১-৮৬)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে আংশিক সময়ের শিক্ষক। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য।

এছাড়া বিভিন্ন সময় যুক্ত ছিলেন 'যুগান্তর' দৈনিকপত্র, এম. পি. বিড়লা ফাউন্ডেশন এবং আন্তর্জাতিক বাইবেল সোসাইটির সঙ্গে।

### সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সন্ধ্যাসংগীত । পাঠান্তর সংস্করণ (পুলিনবিহারী সেন এর সহযোগে)

। ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী। পাঠান্তর সংস্করণ

। রাজা ও রাণী। পাঠান্তর সংস্করণ

। বাংলা শব্দতত্ত্ব (পুলিনবিহারী সেন-এর সহযোগে)

প্রমথ চৌধুরী : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখিত পত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি পত্রিকা'য় যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত।

### অনুবাদ

শঙ্করাচার্য । টি . এম. পি. মহাদেবন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

কবীর । পারসনাথ তেওয়ারী । ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট

এ ছাড়া সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর এই রচনা :

হিন্দু মেলার বিবরণ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৬৭ বর্ষ ২-৪ সংখ্যা।

## 'শেখ আব্দু'-র তৃতীয় সংস্করণ

চতুরঙ্গ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ১ বর্ষ ১৪০০ সংখ্যায় শিবনারায়ণ রায় তাঁর "শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আব্দু" নামক প্রবন্ধে শৈলবালা ঘোষজায়ার বিস্মৃতপ্রায় উপন্যাস 'শেখ আব্দু'-কে কালের করাল গর্ভ থেকে উদ্ধার করেছেন এবং উপন্যাসটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কলকাতায় উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কোন কপি না পেয়ে শিবনারায়ণ রায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের প্রবাসী মাসিক পত্রিকার ১১টি কিস্তিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপন্যাসটির সর্বপ্রথম পাঠের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন।

সম্প্রতি ঢাকার বাংলা একাডেমী লাইব্রেরিতে অন্য একটি বই খুঁজতে গিয়ে 'শেখ আব্দুর' একটি কপি পেয়ে যাই। এটি উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ। ১৯৫৫ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত উপন্যাসটির 'ভূমিকা' থেকে 'শেখ আব্দু' সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া গেল যা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি।

গ্রন্থাকারে "সেখ আব্দু"-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার সময় উপন্যাসটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়। শৈলবালা তাঁর "স্নেহের আব্দু", "জাতীয় উন্নতিকামী উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান হিতৈষী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তে" অর্পণ করেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এবারও শৈলবালা উপন্যাসটির সামান্য পরিবর্তন করেন।

ঢাকা থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণে "আব্দুর আচার ব্যবহার বাচনিক ও পত্রালাপে যা কিছু ত্রুটি ঘটেছিল" তা সংশোধিত হয়। তৃতীয় সংস্করণে উপন্যাসটির নাম 'সেখ আব্দু'-র পরিবর্তে 'শেখ আব্দু' করা হয়। শৈলবালা এই সংস্করণটি উৎসর্গ করেন "কল্যাণীয় দেবর পরলোকগত শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি. এল এবং সুসাহিত্যিক ও অপরিচিত শুভাকাঙ্ক্ষী জনাব আবুল হোসেন এম. এল মরহুমের স্মৃতির সমাদরে"।

শিবনারায়ণ রায় 'শেখ আব্দু' সম্পর্কে তৎকালীন বিদগ্ধ মহলের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ না করায় আমাদের সন্দেহ হয়েছিল যে ওই উপন্যাসটির অসাধারণত্ব এবং গুরুত্বের প্রতি সমসাময়িক বিদগ্ধ পাঠক-সমালোচকদের দৃষ্টি হয়ত আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা ভূমিকা থেকে জানা যাচ্ছে যে উপন্যাসটি অন্তত তৎকালীন বিদগ্ধ বাঙালি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

'শেখ আব্দু' ১৩২২ বঙ্গাব্দে প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম জোরওয়ারগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং সহকারী শিক্ষক ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াকুব আলী চৌধুরী যৌথভাবে লেখিকাকে একটি পত্র লেখেন এবং উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে সৈয়দ এমদাদ আলী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩২৮) একটি সমালোচনা লেখেন এবং 'শেখ আব্দুর মতো উপন্যাস হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে 'সম্ভাবিত ও নিকটবর্তী', করবে বলে উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর চৈত্র ১৩২৮-এর 'সহচর' পত্রিকায় উপন্যাসটির একটি জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক আবুল হোসেন (পরবর্তীকালে 'শিখা' পত্রিকার সম্পাদক এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ)। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু 'মুসলমানী' শব্দের বানান ও প্রয়োগ সম্পর্কিত ত্রুটির প্রতি লেখিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

'শেখ আব্দু' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় শৈলবালা আবুল হোসেন প্রদর্শিত ত্রুটিগুলো সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে আবুল হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় লেখিকার অনুরোধ 'মুসলমানী' শব্দের বানান ও প্রয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটি সংশোধন করে দেন মাঁজানুর রহমান।

সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির বীভৎস তৎপরতার বর্তমান সময়ে উভয়বঙ্গে 'শেখ আব্দু' পুনর্মুদ্রিত হওয়া নিতান্তই জরুরি। পুনর্মুদ্রণের সময় তৃতীয় সংস্করণের (পরবর্তী কোন সংস্করণ পাওয়া না গেলে) পাঠ গ্রহণ করা উচিত — তা বলাই বাহুল্য।

চৌধুরী মুফাদ আহমদ
৩/২১ বেইলী স্কোয়ার অফিসার্স কলোনী
বেইলী রোড, ঢাকা। বাংলাদেশ।

## প্রসঙ্গ শৈলবালা ঘোষজায়া

কিছুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী পুরানো দিনের মহিলা সাহিত্যিকদের বিস্মরণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'স্মরণ করার দায়দায়িত্বটা তো



পুরুষেরই। তাঁরাই তো সমস্ত সাহিত্য জগৎটাকে কব্জা করে রেখে দিয়েছেন। সেখানে তাঁরা যাঁকে রাখবেন রাখবেন। যাঁকে ফেলবেন, ফেলবেন। মেয়েদের লেখা সমালোচকরা তো পড়েন বলে মনে হয় না'। এবং আরও বলেছিলেন — 'অবশ্য কারও কারও মধ্যে হয়ত স্থায়িত্বের উপাদান কম ছিল। তাই বিস্মৃতি এসেছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু শৈলবালা ঘোষজায়াকে ভুলে যাওয়া অন্যায়'।

শ্রদ্ধেয় শিবনারায়ণ রায়ের 'শৈলবালা ঘোষজায়া ও শেখ আব্দু' শীর্ষক রচনাটিতে (চতুরঙ্গ, বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ১ বর্ষা ১৪০০) কিছুদিন পূর্বে আশাপূর্ণা দেবীর করা ওই অভিযোগটিই আরও বিস্তৃতভাবে পাওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র একটি মন্তব্যও স্মর্তব্য : এক মহিলা কবির কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছিল — 'স্ত্রীলোকের কবিতার প্রশংসা করিতে আমরা বড় ভয় পাই, পাছে উৎসাহ দিলে গৃহিণীর দল গৃহকর্ম ছাড়িয়া সকলেই কাগজকলম লইয়া বসেন তাহা হইলে গরিব পুরুষের দল একমুঠা অন্ন পাইবে না'।

কারণ যাই হোক, সে আমলের মহিলা সাহিত্যিকদের অনেকেই যে আজ বিস্মৃত এ এক বাস্তব সত্য। ১৮৬৫ সালে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসকে আমরা মনে রেখেছি কিন্তু সমসাময়িক কালে রচিত মহিলাদের প্রথম কাব্যপ্রয়াস বলে স্বীকৃত কৃষ্ণকামিনীর 'চিত্রবিলাসিনী'কে মনে রাখিনি। বিস্মৃতপ্রায় — অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবীরাও। অথচ, লাইব্রেরির পুরানো বই-এর তাক থেকে ধুলো ঝেড়ে এঁদের বই পড়তে বসলে আজও মনোহরণ করে এঁদের গল্প বলার কৌশল, বিষয়। শিবনারায়ণ রায় শৈলবালা ঘোষজায়ার 'শেখ আব্দু' উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করে যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন বিষয়নির্বাচনে শুধু তখনকার বিচারেই নয়, এখনও এটি সমানভাবে অভিনব — ঠিক তেমনই অন্যান্যদের অনেক লেখাতেই এই গুণ পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। সেজন্য অন্যান্যদের লেখা নিয়েও এরকম যোগ্য আলোচনা খুবই প্রয়োজন।

সুদীপ জোয়ারদার
পাগলাচণ্ডী, নদীয়া